দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

অরণ্য ষষ্ঠী আজও কেন প্রাসঙ্গিক?
— পৃ: ২৩

সামাজিক ন্যায় বনাম তোষণ নীতি : পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক প্রেক্ষিত
— পৃঃ ১৪

৭৬ বর্ষ, ৩৮ সংখ্যা।। ১০ জুন, ২০২৪।। ২৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১।। যুগাব্দ - ৫১২৬।। website : www.eswastika.com

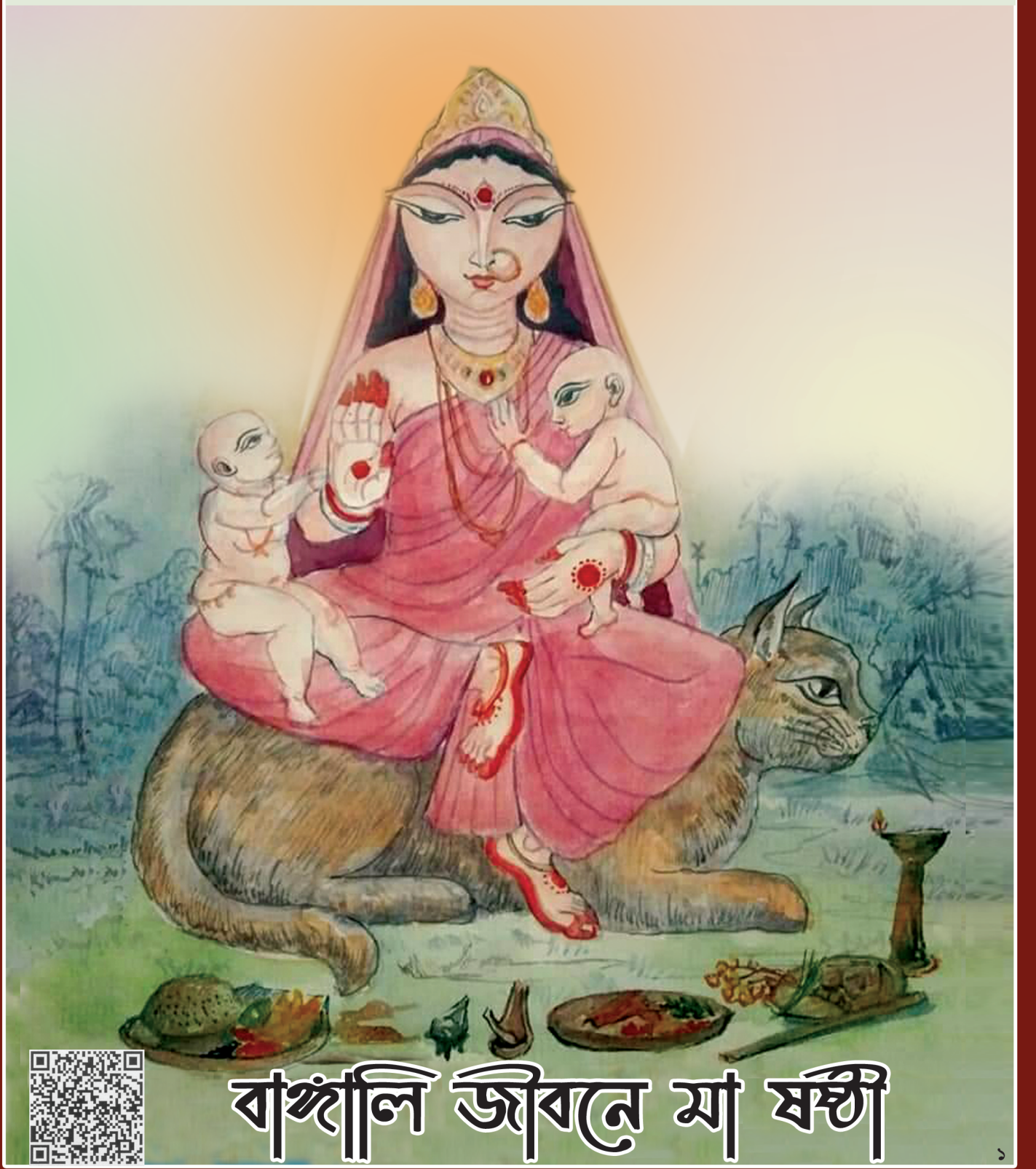

বাঙালি জীবনে মা ষষ্ঠী

CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™
zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৬ বর্ষ ৩৮ সংখ্যা, ২৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

১০ জুন - ২০২৪, যুগাব্দ - ৫১২৬,

Website : www.eswastika.com

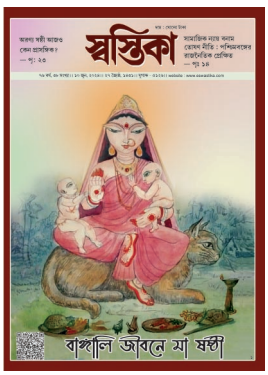

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ : শীর্ষ আচার্য্য

রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

'পথ হারিও না আলোর আশায়' □ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় □ ৬

বিপজ্জনক খেলা বন্ধ হওয়া প্রয়োজন □ অজয় ভট্টাচার্য □ ৭

কমছে হিন্দু, বাড়ছে বিপদ □ প্রশান্ত বাজপেয়ী □ ৮

টানা তৃতীয়বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী □ বিশ্বামিত্র □ ১০

ধুপগুড়িতে মন্দিরে আক্রমণ : প্রতিবাদের ওপর বুলডোজার চালাচ্ছে পুলিশ □ একলব্য রায় □ ১১

সামাজিক ন্যায় বনাম তোষণনীতি---পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক প্রেক্ষিত □ পল্লব মণ্ডল □ ১৪

বিশ্বাসঘাতকতার পরম্পরায় বাঙ্গালি হিন্দুজাতি দিশাহারা □ চন্দন রায় □ ১৬

ভারতীয় পণ্য বর্জনের আহ্বানকারী পিনাকী বাংলাদেশে এখন বর্জিত ব্লগার □ সেন্টুরঞ্জন চক্রবর্তী □ ১৮

অরণ্যষষ্ঠী আজও সমান প্রাসঙ্গিক □ কল্যাণ গৌতম □ ২৩

ফল পরিচিতি : বুদ্ধ নারকেল □ সম্বিত চৌধুরী □ ২৫

আম এবার টানাটানি, বাজার ছেয়েছে 'চীনাফল' □ ড. কল্যাণ চক্রবর্তী □ ২৬

ফলহারিণী তিনি ফলদায়িনী □ নন্দলাল ভট্টাচার্য □ ৩১

বলির মাংস প্রসাদস্বরূপ □ অচিন্ত্যরতন দেবতীর্থ □ ৩৪

চিপকো আন্দোলনের পথিকৃৎ সুন্দরলাল বহুগুণা □ ড. সর্বাণী চক্রবর্তী □ ৩৫

বর্তমান যুগে সংস্কৃত ভাষার প্রয়োজনীয়তা □ লিপিকা দত্ত □ ৩৮

বঙ্গের স্বল্প পরিচিত ফল ও লোকসংস্কৃতি □ ড. মনাঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায় □ ৪৩

জলসম্পদের সংরক্ষণ জরুরি □ শেখর সেনগুপ্ত □ ৪৬

নিয়মিত বিভাগ :

চিঠিপত্র : ১৯-২০ □ সুস্বাস্থ্য : ২১-২২ □ সমাবেশ সমাচার : ২৯-৩০ □ অন্যরকম : ৩৯ □ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ □ সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৮-৫০

প্রকাশিত হবে ১৭ জুন, ২০২৪

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ১৭ জুন, ২০২৪

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

তৃতীয়বারও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

পরপর তিনবার ভারতের প্রধানমন্ত্রী পদে শপথ নিয়ে নজির গড়লেন নরেন্দ্র মোদী। অ-কংগ্রেসি দল হিসাবে এনডিএ পরপর তৃতীয়বার ভারতের শাসন ক্ষমতায় বসার জনাদেশ পেয়েছে। আবার প্রমাণিত হলো বিরোধীদের হাতে দেশের সুরক্ষার ভার দিতে রাজি নয় ভারতের মানুষ।

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় এই বিষয় নিয়েই আলোচনা করবেন কয়েকজন বিশিষ্ট রাজনৈতিক বিশ্লেষক।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION
A/C. No. : **103502000100693**
IFSC Code : **IOBA0001035**
Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK
Branch : **Sreemani Market**
Kolkata-700 006

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে। সকল পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীর নিকট বিনীত নিবেদন, তাঁরা যেন এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন এবং আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা করেন।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেকSubhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**
Bank A/c --- 103502000100693
IFSC -- IOBA0001035
Bank -- Indian Overseas Bank
Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

অরণ্যষষ্ঠী অরণ্যরক্ষারই ব্রত

ভারতবর্ষে সংবৎসর জুড়িয়া নানা উৎসব হইলেও বাঙ্গালির কিন্তু বারো মাসে তেরো পার্বণ। তেরো পার্বণ ছাড়াও কত যে নারী ব্রত রহিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এই রকমই একটি হইল ষষ্ঠীব্রত। পুরাণ মতে মা দুর্গার একটি রূপ হইলেন মা ষষ্ঠী। হিন্দু পঞ্জিকা অনুসারে প্রতি মাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠীতিথিতে ষষ্ঠীদেবী পূজিত হন। স্থানভেদে এই ষষ্ঠীদেবী বিভিন্ন নামে বিভিন্ন মাসে পূজিত হন। যেমন, বৈশাখমাসে ধুলাষষ্ঠী, চন্দনষষ্ঠী বা চন্দনীষষ্ঠী। জ্যৈষ্ঠমাসে অরণ্যষষ্ঠী, জামাইষষ্ঠী, স্কন্দষষ্ঠী, বাটাষষ্ঠী। আষাঢ়মাসে কোড়াষষ্ঠী, কদমষষ্ঠী, কর্দমীষষ্ঠী, কর্দমষষ্ঠী বা বিপত্তারিণী ব্রত। শ্রাবণমাসে লোটনষষ্ঠী বা লুণ্ঠনষষ্ঠী। ভাদ্রমাসে মাথানীষষ্ঠী, মন্থনষষ্ঠী, চর্পটাষষ্ঠী, চাপড়াষষ্ঠী, সূর্যষষ্ঠী, অক্ষয়ষষ্ঠী, সরদেশীষষ্ঠী। আশ্বিনমাসে দুর্গাষষ্ঠী, বোধনষষ্ঠী। কার্তিকমাসে গোঠষষ্ঠী, নাড়ীষষ্ঠী বা ছটপূজা। অগ্রহায়ণমাসে মুলাষষ্ঠী, গুহাষষ্ঠী, মুলকষষ্ঠী। পৌষমাসে পাটাইষষ্ঠী, অন্নরূপাষষ্ঠী। মাঘমাসে শীতলষষ্ঠী। ফাল্গুনমাসে অশোকষষ্ঠী, গোরূপিনীষষ্ঠী এবং চৈত্রমাসে নীলষষ্ঠী।

ষষ্ঠীদেবীর ব্রত বিভিন্ন পুরাণে উল্লিখিত থাকিলেও তাহা বৈদিক পার্বণ নহে, লৌকিক পার্বণ। আর এই ষষ্ঠীব্রত শুধুমাত্র বাঙ্গালি নারীর ব্রত নয়। তাহা সমগ্র ভারতবর্ষের নারীব্রত। জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লা ষষ্ঠীতিথির ব্রত অরণ্যষষ্ঠী প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতিপূজার প্রতীকস্বরূপ। নববর্ষার আগমনে প্রকৃতি উর্বর হইবার ফলে যে বৃক্ষরাজির সৃষ্টি হইয়া থাকে তাহা রক্ষার নিমিত্তই এই ব্রত। এই ব্রত অনুষ্ঠান ব্রতিনীরা গৃহের অভ্যন্তরে করেন না। ব্রতিনীরা লোকালয়ের অদূরে কোনো বৃক্ষকে কেন্দ্র করিয়া অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। বৃক্ষটিকে হলুদ সুতায় জড়াইয়া তাহার অবশিষ্টাংশ কন্যা-জামাতার হস্তে বন্ধন করিয়া দেওয়া হয়। আশীর্বাদ করেন, বৃক্ষের ন্যায় তাহার পরিবার পরিজন দীর্ঘায়ু হউক, কন্যা শীঘ্র পুত্রবতী হউক। অরণ্যষষ্ঠীতে অরণ্যপূজা বা বৃক্ষপূজা কোনো অর্বাচীন নারীব্রত নহে। হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া হিন্দু নারীরা এই ব্রত পালন করিয়া আসিতেছেন, তাহার প্রমাণ তো বিভিন্ন পুরাণগ্রন্থ। বৃক্ষ যে প্রাণবায়ু উৎসর্জন করিয়া থাকে, তাহাকেও যে নিজ সন্তানের ন্যায় রক্ষা করিতে হয়, তাহার ধারণাও প্রাচীন মুনি-ঋষিগণ এই নারীব্রতের মাধ্যমে জনমানসে প্রোথিত করিয়াছেন। সেইজন্যই বোধহয় এই মরসুমের যাবতীয় ফল প্রসাদ হিসাবে মা ষষ্ঠীকে নিবেদন করা হয়। আর সেই প্রসাদ ষষ্ঠীতলাতে উপস্থিত সবাইকে বিতরণ করা হয় যাহাতে সেই সমস্ত ফলের বীজ জঙ্গলেই প্রোথিত হইয়া পুনরায় নূতন বৃক্ষের সৃষ্টি হয়।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হইল, বনসৃজন, বনরক্ষণ ও বনবর্ধনের ন্যায় একটি বিজ্ঞানসম্মত ব্রত যে কীভাবে জামাইষষ্ঠীতে পর্যবসিত হইয়া শুধুমাত্র ভূরিভোজের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িল, তাহার সন্ধান কেহ করিল না। জামাইষষ্ঠীর দিনে জামাই বাবাজীবনের হস্তে একটি বৃক্ষরোপণ করিলেও তো পর্বটি মাধুর্যমণ্ডিত হইয়া উঠিত। খুবই দুঃখের যে, পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহে পড়িয়া অধিকাংশ মানুষ ভারতীয় উৎসবের অন্তর্নিহিত ভাবটি বিস্মৃত হইয়াছে। বৃক্ষপূজার দিনটিতে কলকাতা শহরে তো বটেই, জেলা শহরগুলিতেও বৃক্ষশাখা কর্তন করিয়া আনিয়া গৃহমধ্যে ভক্তিহীন ব্রত উদ্‌যাপন চলিতেছে। ইহা খুবই পরিতাপের বিষয়। আরও একটি পরিতাপের বিষয় হইল, এই জ্যৈষ্ঠমাসেই বনমহোৎসবের নামে আত্মপ্রচারের ধুম পড়িয়া যায়। পরিকল্পনাহীন ভাবে একটি বৃক্ষ রোপণ করিয়া দশজনে মিলিয়া তাহার ছবি তুলিয়া, তাহা সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করিয়া লক্ষ্য রাখা হয়, কত লাইক পড়িল। তাহাই মূল লক্ষ্য, বৃক্ষটি জীবিত রহিল কিনা তাহাতে কোনো ভ্রূক্ষেপ নাই। পরিবেশ বিজ্ঞানীরা জানাইয়াছেন, নির্বিচারে অরণ্য ধ্বংসের কারণেই প্রকৃতি তাহার ভারসাম্য হারাইয়াছে। প্রকৃতির রোষে পড়িয়াছে মানব সভ্যতা। ইহা হইতে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় হইল, নিবিড় অরণ্য সৃজন। অরণ্যষষ্ঠীর অন্তর্নিহিত ভাবটি অনুধাবন করিয়া ব্যাপক অরণ্যসৃজন করিলেই ব্রত পালনের সার্থকতা। নচেৎ তাহা জামাইষষ্ঠীর নামে ভূরিভোজের মধ্যেই আবদ্ধ থাকিয়া যাইবে।

সুভাষিতম্

অপূজ্যা যত্র পূজ্যন্তে পূজ্যানামবমাননা।
ত্রীণি তত্র প্রবর্তন্তে দুর্ভিক্ষং মরণং ভয়ম্।।

যেখানে অপূজ্য লোকের পূজা করা হয় এবং পূজ্য লোকের অসম্মান করা হয়, সেখানে দুর্ভিক্ষ, মৃত্যু ও ভয়— তিনটিই প্রকটরূপে দেখা দেয়।

‘পথ হারিও না আলোর আশায়’

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

‘বিজেপি থাকতে এসেছে যেতে নয়’। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একদা উপদেষ্টার কথা হয়তো সত্য হতে চলেছে। এনডিএ-র আসন সংখ্যা কমলেও, এ লেখা যখন ছাপা হবে তার আগেই তৃতীয়বারের জন্য দেশে নরেন্দ্র মোদী চালিত বিজেপি সরকার তৈরি হয়ে যাবে। ভোট সমীক্ষার ইঙ্গিত বাস্তবে পরিবর্তিত হলেও ২০২৬-এর রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের ওপর বিজেপির এবার জোর দেওয়া উচিত। সারা দেশে বিজেপি একমাত্র রাজনৈতিক দল যারা কেবল ভোটের রাজনীতি করে না। রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের জন্য বিজেপির অন্য পন্থা রয়েছে। এটাই তাদের বৈশিষ্ট্য আর সাফল্য। বিজেপি যে ধরনের রাজনীতি করে তার সমতুল্য রাজনৈতিক শক্তি এই মুহূর্তে দেশে নেই। আচার-ব্যবহার, সংস্কৃতি, ভাষাকে কেন্দ্র করে বিজেপি সামাজিক কর্মসূচি তৈরি করে যার ভিতর রাজনীতি আর ভোট রয়েছে। অন্য দল থেকে যারা বিজেপিতে যোগদান করেছেন, বা বিজেপি নেতৃত্বাধীন জোটকে সমর্থন করছেন--- বিজেপির লক্ষ্য থাকে সেই নেতা-কর্মীদের এবং সহযোগী দলগুলিকে কীভাবে সংস্করিত করা যায়। এই পদ্ধতি সাধারণ রাজনৈতিক চিন্তার অনেক বাইরে। ফলে অন্য রাজনৈতিক দলগুলি তা ধরতে পারে না।

এবারের ভোটে বিজেপি পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। ভোট প্রচারে মোদীজী অনেকগুলি জনসভা করেছেন এই দুই অঞ্চলে। উত্তর আর পশ্চিম ভারত বিজেপির গড়। বিজেপি জানত সেখানে আসন বৃদ্ধির বড়ো সম্ভাবনা খুব একটা নেই। এখানে ৩১৫টি আসনের মধ্যে বিজেপি ২০১৯-এ ২৭০টি আসন পায় আর দক্ষিণ ও পূর্ব ভারতে ৭টি রাজ্যে ২২০টি আসনের মধ্যে বিজেপি ৫০টি-র বেশি আসন পায়নি। এবার কেরালা ও তামিলনাড়ুতে বিজেপি খাতা খুলেছে। তেলেঙ্গানা ও অন্ধ্রপ্রদেশে বড়ো ভাবে উঠে এসেছে। পশ্চিমবঙ্গে প্রত্যাশার তুলনায় ১০টি আসন কম হলেও ওড়িশায় চমকপ্রদ ফল করে সেই রাজ্যের ক্ষমতা দখল করেছে।

১৯৮৪ সালের পর থেকে কংগ্রেস এককভাবে কোনো ভোট জেতেনি। ১৯৮০ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিজেপি এককভাবে ভোটে জিততে পারেনি। ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদী তার ব্যতিক্রম ঘটান। এবার তিনি হ্যাটট্রিক করলেন। মিথ্যা অহমিকায় ডুবে থাকা মমতার বিরুদ্ধে বিজেপির সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি বিশেষ প্রয়োজন। এবারের ভোটে আনুমানিক ৮২ হাজার বুথের অর্ধেকের বেশিতে তারা কর্মী দিতে পারেনি। মমতার বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভকে তারা কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছে। এই নির্বাচনে তাদের শক্তিক্ষয় হলেও ভবিষ্যতে সাংগঠনিক শক্তি সংহত করার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। বিদেশি সিপিএম যথারীতি নিজেদের কবর খুঁড়েছে। ২০২১ সালে এই রাজ্যে তারা ‘নো ভোট টু বিজেপি’ প্রচার করে নিজেদের নাক কেটে বিজেপির যাত্রাভঙ্গ করার সবরকম প্রয়াস চালায়। এইবারেও এই বাম-কংগ্রেস জোট সবকটি আসনে প্রার্থী দাঁড় করিয়ে শাসক তৃণমূল বিরোধী ভোট ভাগ করে ফের তৃণমূলেরই সুবিধে করে দিলো। অনেকে বলছে মমতা ‘ভাইপো সিনড্রোমে’ (অভিষেক বাঁচাও) আক্রান্ত আর আসক্ত। ১৯৭৯ সালে ইন্দিরা গান্ধীর পতনে আওয়াজ উঠেছিল ‘তেলে আর ছেলে ইন্দিরাকে খেলে!’ আগামীদিনে মমতারও হয়তো ভবিতব্য সেটাই। পরিবার আর কারবারেই আপাতত মমতা সদা ব্যস্ত।

অত্যাচারী বামকে সরিয়ে এখন দুর্নীতির ঘরে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছেন মমতা। রাজ্যে অধিকাংশ লোকসভা আসনে জিতলেও তৃণমূলের অতি বড়ো সমর্থনকারী মাত্রই সাধারণ মানুষের চোখে ‘চোর’।

অনেকের মতে পশ্চিমবঙ্গের মতো ঐতিহ্যমণ্ডিত রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে মমতা বেমানান। অত্যাচারী বামকে সরিয়ে এখন দুর্নীতির ঘরে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছেন। রাজ্যে অধিকাংশ লোকসভা আসনে জিতলেও তৃণমূলের অতি বড়ো সমর্থনকারী মাত্রই সাধারণ মানুষের চোখে ‘চোর’। এই ধারণা একেবারেই স্বাস্থ্যকর নয়। অতি বাঙ্গালিয়ানার মিথ্যা ধ্বজা, সংখ্যালঘু তোষণ আর ভাষা সন্ত্রাস চালিয়ে টিকে থাকা যে সহজ নয় মমতা তা ভালো জানেন। এই নির্বাচনে জিতলেও গোদের উপর বিষফোঁড়া সীমাহীন দুর্নীতি। অথচ অস্তিত্ব বাঁচাতে মমতাকে তোষণ আর দুর্নীতিকে ভর করতেই হবে। কারণ এই ভয়াবহ নীতি তিনি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছেন। বাঘের পিঠে চড়লে কিন্তু নামা যায় না। ‘রাস্তায় আগুন’ বা ‘অ্যাঙ্গার অন দ্য স্ট্রিটস্’ কথার অর্থ শাসকের বিরুদ্ধে মানুষের তীব্র ঘৃণা। সেই ঘৃণার আগুনে ভবিষ্যতে পুড়বেন মমতা। বার বার জিতে গিয়ে এই সত্য তিনি বুঝেও বুঝতে চাইছেন না। তাঁর দল এবার পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকসভা আসন জেতার ফলে বিভিন্ন জেলায় হিন্দুদের ওপর ভোট পরবর্তী সন্ত্রাসের সম্ভাবনা তীব্র হচ্ছে। সাধুসন্তদের উপরেও নির্বাচন পরবর্তী হিংসা নেমে আসতে পারে। আলোর আশায় থাকা বিজেপি এই সন্ত্রাস প্রতিরোধে যেন পথভ্রষ্ট না হয়। বিপদে-আপদে তাদের সংগঠন সর্বত্র হিন্দুদের পাশে থাকে কী না, প্রয়োজন মতো আইনি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় কী না সেটাই দেখার। ■

বিপজ্জনক খেলা বন্ধ হওয়া প্রয়োজন

অজয় ভট্টাচার্য

পশ্চিমবঙ্গ সরকার দ্বারা প্রদান করা সমস্ত ওবিসি শংসাপত্র ২০১০ সালের পর থেকে বাতিলের নির্দেশ দিয়ে কলকাতা হাইকোর্ট শুধুমাত্র মমতা ব্যানার্জী প্রশাসনের নয়, ভারতীয় রাজনীতিতে তুষ্টীকরণের রাজনীতির প্রবৃত্তিকেও কশাঘাত করেছে। ওবিসি কোটার অপব্যবহার করে নগ্নভাবে মুসলমান ভোট চাওয়ার দৃষ্টান্ত শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই ঘটেনি, আরও বেশ কয়েকটি রাজ্যেও এই নির্লজ্জ ঘটনা ঘটেছে। নির্লজ্জতা দৃষ্টান্ত এখানেই শেষ নয়। জামিয়া মিলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলমানদের জন্য ৫০ শতাংশ আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে দিয়েছে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকার। এরজন্য তারা প্রয়োজনীয় আইন পাশ করেছিল ২০১১ সালে। এর আগে ২০০৫ সালে তারা আরও একটি অনুমোদন পাশ করেছিল। সেই বিধি অনুযায়ী আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়েও মুসলমানদের জন্য ৫০ শতাংশ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। ২০২৩ সালে অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী জগনমোহন রেড্ডি নেতৃত্বাধীন ওয়াইএসআর কংগ্রেস একটি প্রস্তাব পাশ করে। সেই প্রস্তাব অনুযায়ী দলিত সম্প্রদায়ের যারা ধর্মান্তরিত হয়ে খ্রিস্টান হয়েছে, তাদের এসসি স্ট্যাটাস দেওয়া হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। একইরকমভাবে ২০২১ সালে মহারাষ্ট্র কংগ্রেস মুসলমানদের সংরক্ষণ দেওয়ার পক্ষে একটি প্রস্তাব পাশ করে। শুধু মহারাষ্ট্রে নয়, রাজস্থান, তেলেঙ্গানা, মধ্যপ্রদেশ সর্বত্র কংগ্রেস একই প্রচেষ্টা জারি রেখেছে। এই সবকিছুর লক্ষ্য হলো মুসলমান ভোটব্যাংক। তার বিনিময়ে প্রকৃত এসসি, এসটি, ওবিসিদের সংবিধান প্রদত্ত অধিকার ক্ষুণ্ণ হলেও ওদের কিছু যায় আসে না। অথচ সংবিধানের সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে বাবাসাহেব আম্বেদকর যে সামাজিক বৈষম্য দূর করতে চেয়েছিলেন, তা আজও বাড়িয়ে দেবে এদের সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থ। তাই কলকাতা হাইকোর্টের রায় শুধু ঐতিহাসিক নয়, একটি মাইলফলকও।

আশ্চর্যের বিষয় যে, যারা মুসলমান ভোটকে পাখির চোখ করে লড়ে, তারাই বড়ো মুখ করে ধর্মনিপেক্ষতার কথা বলে। মুসলমান ভোট পাওয়ার জন্য যারা দেশে সংবিধানকে অস্বীকার করে বেআইনিভাবে সংরক্ষণ দিতে পারে, তারাই বলে সংবিধান বিপন্ন। এর চাইতে বড়ো দ্বিচারিতার আর কিছু আছে নাকি? দ্বিচারিতার এখানেই শেষ নয়, ইদের নমাজের সমাবেশ থেকে বিজেপির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ডাক দিতে যে নেত্রী বলতে পারেন, বিজেপি ধর্মের ভিত্তিতে মানুষকে ভাগ করতে চাইছে, তিনিই মুসলমান ভোটারদের দুধেল গাই বলে তাদের লাথি সহ্য করার কথাও বলে থাকেন। সারা দেশে ৮৬টি লোকসভা কেন্দ্র আছে যেখানে ২০ শতাংশ বা তার বেশি মানুষ মুসলমান সম্প্রদায়ের। এই ৮৬ টির মধ্যে ১৬টি কেন্দ্রে মুসলমান জনসংখ্যা ৫০ শতাংশে বেশি। এই ভোটের কথা মাথায় রেখেই কংগ্রেস-সহ ইন্ডি জোটের শরিকরা তুষ্টীকরণের রাজনীতিতে একে অপরকে টেক্কা দিচ্ছে। যেমন, কংগ্রেস সওয়াল করেছে দেশের সম্পদে প্রথম অধিকার মুসলমানদের। বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী লালুপ্রসাদ যাদব মুসলমানদের জন্যই পূর্ণ সংরক্ষণের কথা বলেছেন। পশ্চিমবঙ্গে ৪২টির বেশি লোকসভা কেন্দ্র আছে যেখানে মুসলমান ভোটার ২০ শতাংশ বা তার বেশি। সেই লক্ষ্যে তৃণমূল কংগ্রেস সন্দেশখালিতে শাজাহানের অত্যাচারকে দুধেল গাইয়ের লাথি হিসেবে মাথায় তুলে নিয়েছে। তারজন্য শাজাহানকে নিরপরাধ সাজানোর জন্য সন্দেশখালি কাণ্ডের দায় বিজেপির ওপর চাপানোর চেষ্টা করেছে। তারা রোহিঙ্গা মুসলমানদের নিয়ে অ্যাকশন বাহিনী গড়ে তুলেছে। ভোটের লোভে তারা জেলায় জেলায় অনেক সন্দেশখালি গড়ে তুলেছে। ভূপতিনগরে এনআইএ আধিকারিকদের ওপর হামলার ঘটনাকেও ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের ভোটার কার্ড বানিয়ে দিয়ে,তাদের ভোটাধিকারের ব্যবস্থা করে দিয়ে নির্বাচনকেন্দ্রগুলির জনবিন্যাসে পরিবর্তন করে ফেলেছে। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী অভিযোগ করে বলেছেন যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভোটব্যাংকের লোভে ৭৭টি মুসলমান সম্প্রদায়কে ওবিসি তালিকাভুক্ত করে প্রকৃত দাবিদারদের অধিকার খর্ব করেছে।

তুষ্টীকরণ রাজনীতির কারণেই ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে ৭৫ শতাংশ মুসলমান ভোট পেয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস। এই তথ্যটুকুই প্রমাণ করে যে তৃণমূলের তুষ্টীকরণের বহর কত। শুধুমাত্র তোষণের রাজনীতি জন্যই সাধু-সন্ন্যাসীরাও মুখ্যমন্ত্রীর কটাক্ষের কবলে পড়েন। হিন্দু আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠানগুলিকেও আক্রমণ করেন। এরপরও তারা দাবি করে, তারাই ধর্মনিরপেক্ষ ও অসাম্প্রদায়িক দল!

সারা দেশের মধ্যে উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারে সবচেয়ে বেশি কেন্দ্র আছে যেখানে জয়-পরাজয়ে নির্ণায়ক শক্তি হয়ে দাঁড়ায় মুসলমান ভোট। দেশ ও জাতির কল্যাণার্থে নিয়োজিত হলে কোনো রাজনৈতিক দলকে মুসলমান তোষণের মাধ্যমে বেঁচে থাকার প্রয়োজন হয় না। বিজেপিই তার প্রমাণ। তোষণের রাজনীতি না করেও বিজেপি জোট তৃতীয়বার কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন হয়েছে। কিন্তু তোষণ রাজনীতির কুফল পশ্চিমবঙ্গের মানুষ আর কবে ভাববে? □

অতিথি কলম

প্রশান্ত বাজপেয়ী

কমছে হিন্দু, বাড়ছে বিপদ

সহজ-সরল এই হিসাবটিকে নানাভাবে তথ্য-বিকৃতির মাধ্যমে পরিবেশন করার খেলা জারি রয়েছে। বলা হচ্ছে, ভারতে হিন্দু জনসংখ্যা কমে যাওয়ার কথা অসত্য।

বিগত কয়েক দশক ধরে ভারত জুড়ে রাজনীতির এক কুটিল খেলা চলছে। তথাকথিত সংখ্যালঘুদের অধিকারের প্রশ্নে আবর্তিত হয় এই দেশের রাজনীতি। বিভিন্ন রাজ্যের স্থানীয় ঐতিহ্য,পরম্পরা ও ভাষা সংরক্ষণের দাবিও শোনা যায়। সংখ্যা নির্ধারণের জন্য নানা মহল থেকে জাতি গণনার বিষয়টিরও উল্লেখ করা হয়। কিন্তু দেশে হিন্দুদের সর্বমোট সংখ্যা নির্ধারণ বা হিন্দু জনসংখ্যা হ্রাসের মতো বিষয়গুলি আলোচনাক্রমে উঠে এলে সেই প্রসঙ্গে আলোচনাকে চেপে দেওয়া বা সেই সংক্রান্ত কথাবার্তাকে দাবিয়ে দেওয়ার প্রবণতাও বিশেষ লক্ষণীয়। এখানে মুসলমানদের বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দিয়ে সেগুলিকে কেন্দ্র করে গঠিত হয় সাচার কমিটি। আবার এই কমিটির তরফে পেশ করা সেই বিতর্কিত রিপোর্টটিকে হাতিয়ার করে বলা হয় যে দেশের যাবতীয় সম্পদে প্রথম অধিকার হলো মুসলমানদের! এই তথাকথিত সংখ্যালঘুদের স্বার্থেই গঠিত হয়— রঙ্গনাথ কমিশন। কিন্তু এতো কিছু সত্ত্বেও হিন্দুদের জনসংখ্যা হ্রাস বিষয়ে কোনো আলোচনা বা এই বিষয়টির উপর কোনো পর্যালোচনা পর্যন্ত হয় না। এখানেই উঠে আসে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। হিন্দুরা যদি কোনো ক্রমে সংখ্যালঘু হয়ে যায় তবে 'ভারত'— ভারতই থেকে যাবে তো? জোরালো ভাবে আজ এই প্রশ্ন তোলার এবং তার উত্তর খোঁজার সময় এসেছে। হিন্দুদের জনসংখ্যা হ্রাসপ্রাপ্তির বিষয়ে জনসচেতনতা বিশেষ আবশ্যক। কারণ হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্যই এই দেশে রয়েছে বেদ, উপনিষদ, গীতা, জৈনসূত্র ও ত্রিপিটকের অস্তিত্ব, দেশে বিরাজ করছে শান্তির বাতাবরণ।

উদ্বেগজনক পরিসংখ্যান : সম্প্রতি 'শেয়ার অফ রিলিজিয়াস মাইনরিটি : এ ক্রস-কান্ট্রি অ্যানালিসিস, ১৯৫০-২০১৫'— শীর্ষক একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। আমেরিকাস্থিত গবেষকদের একটি গোষ্ঠী বিশ্বের ১৬৭টি দেশের ওপর গবেষণা চালিয়ে 'রিলিজিয়াস ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ স্টেটস্'— শীর্ষক একটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছে। তার ফলে ইসলাম, খ্রিস্টান, পার্সি, ইহুদি ইত্যাদি উপাসনা পদ্ধতি অনুসরণ করা লোকজনের জনসংখ্যাগত পরিবর্তনের তথ্য প্রকাশ্যে এসেছে। ৮ মাস আগে এই রিপোর্টটির ভিত্তিতে প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা পরিষদের তরফে ভারতে সংখ্যালঘুদের অবস্থার ওপরে একটি বিস্তারিত রিপোর্ট তৈরির কাজ শুরু হয়। এই রিপোর্টে উঠে আসা তথ্য রীতিমতো চমকে দেওয়ার মতো। এই রিপোর্ট অনুযায়ী, ভারতে স্বাধীনতা পরবর্তী পর্যায়ে হিন্দুদের জনসংখ্যা ক্রমাগত কমছে এবং ১৯৫০ সালের তুলনায় ২০১৫ সালে হিন্দুদের জনসংখ্যা কমেছে প্রায় ৮ শতাংশ, যেখানে মুসলমানদের সংখ্যা বেড়েছে ৪৩.৫ শতাংশ। দেশভাগের ফলে ভারত থেকে বিযুক্ত পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তানে (পরবর্তীকালে বাংলাদেশে) ১৯৫০ সালের তুলনায় কমতে কমতে হিন্দুদের জনসংখ্যা বর্তমানে প্রায় নগণ্য এবং তার বিপ্রতীপে এই দুটি দেশে মুসলমানদের জনসংখ্যা এতগুলি দশক ধরে ক্রমবর্ধমান। পাকিস্তানে মুসলমানদের সংখ্যা ৭৭.৪৫ শতাংশ থেকে বেড়ে ৮৮.০২ শতাংশে পৌঁছেছে, বাংলাদেশে মুসলমানদের সংখ্যা ৭৪.২৪ শতাংশ থেকে বেড়ে হয়েছে ৮৮ শতাংশ। এমনকী নেপালেও হিন্দুদের সংখ্যা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়েছে।

মিথ্যের বেসাতি, আসল ঘটনা চেপে দেওয়া ও সত্যকে বেমালুম অস্বীকার : গবেষণালব্ধ তথ্যসমূহ প্রকাশ্যে আসার সঙ্গে সঙ্গে এক শ্রেণীর রাজনীতিক ও একটি বিশেষ বিচারধারার লোকজনের তরফে এই তথ্যগুলিকে অস্বীকার করার এবং চেপে দেওয়ার লাগাতার প্রয়াস শুরু হলো। দেশকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে কিছু রাজনৈতিক নেতা, কিছু তথাকথিত বুদ্ধিজীবী ময়দানে নেমে পড়লেন। পুরনো ছক ও কৌশল অবলম্বনে ইস্যুটির থেকে নজর ঘোরাতে প্রথমেই তারা বিষয়টিকে মিথ্যা বলে দাগিয়ে দেয় এবং তারপরেই তাদের স্ট্র্যাটেজি অনুযায়ী তথ্য-পরিসংখ্যানগুলিকে এমনভাবে পেশ করতে থাকে যাতে মূল ইস্যুটি আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু থেকে সরে যায়।

এইসব লেখক ও বুদ্ধিজীবীরা ভালোই জানে যে নিত্যদিনের জীবনযুদ্ধে শামিল সাধারণ মানুষ কখনোই সব কিছু তলিয়ে দেখেন না, খুঁটিয়ে ভাবেন না। এই কারণে আলোচনার দিক পরিবর্তন করে, পরিকল্পিতভাবে জনমানসে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে, এটিকে বিতর্কিত আখ্যা দিয়ে পুরো বিষয়টিকে চেপে দেওয়া সম্ভব। ক্রমহ্রাসমান হিন্দু

জনসংখ্যার সত্যকে গোপন করতে ২০০১ থেকে ২০১১-র মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানদের বেশি বলে প্রচার করা হচ্ছে। এই তত্ত্ব তুলে ধরে হিন্দুদের জনসংখ্যা হ্রাসের ঘটনা ভুল বলেও ব্যাখ্যা করা চলছে। বাস্তবে, ১৯৯১ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত মুসলমানদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল— ২৯.৩ শতাংশ, যা ২০০১ থেকে ২০১১-র মধ্যে ২৪.৬ শতাংশে দাঁড়ায়। এই দুই দশক সময়কালে হিন্দু জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২০ শতাংশ থেকে কমে দাঁড়ায় ১৬.৮ শতাংশে।

এর অর্থ হলো এখনও পর্যন্ত হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অনেকটাই বেশি। ১৯৫০ সালে ভারতে হিন্দু জনসংখ্যা ছিল ৩০ কোটি ৩৬ লক্ষ, যা আজ হয়েছে ৯৬ কোটির কাছাকাছি। ১৯৫১ সালে মুসলমান জনসংখ্যা ছিল ৩ কোটি ৫৩ লক্ষ যা আজ ২০ কোটি ছাড়িয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ, বিগত ৭ দশকে হিন্দু জনসংখ্যা বেড়েছে ৩ গুণ, মুসলমানদের জনসংখ্যা বেড়েছে প্রায় ৭ গুণ।

সহজ-সরল এই হিসাবটিকে নানাভাবে তথ্য-বিকৃতির মাধ্যমে পরিবেশন করার খেলা জারি রয়েছে। বলা হচ্ছে যে ভারতে হিন্দু জনসংখ্যা কমে যাওয়ার কথা অসত্য। এই অপপ্রচারের পিছনে লুকিয়ে রয়েছে অন্য একটি কৌশল। এর মাধ্যমে একদিকে যেমন প্রকৃত সত্যকে আড়াল করার চেষ্টা চলছে, তেমনই অন্যদিকে--- ভারতে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতাবাদের প্রভাব বাড়ছে, সংখ্যালঘু বিশেষত মুসলমানদের ওপর অত্যাচার চলছে— এই জাতীয় অপপ্রচার পুরোদমে চলছে। বিরোধী পক্ষের তাবড় নেতারাও বিদেশে গিয়ে এই জাতীয় বক্তব্য রেখেছেন।

এই ধরনের বুদ্ধিবৃত্তি ও রাজনীতির একটি অন্যরকম চেহারাও আছে। প্রথমেই এরা এই পরিসংখ্যানগুলির বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দেয়। তারপর তারা বলে যে এই তথ্যগুলি সত্যি হলে তা নাকি ভারতবাসীর গর্বের কারণ। দেশের সংখ্যালঘুদের সঙ্গে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুরা ভালো আচরণ ও ব্যবহার করছে এই পরিসংখ্যান তারই প্রমাণ। তাদের কথা হলো এই তথ্যে আপামর ভারতবাসীর সন্তুষ্ট থাকা উচিত। অর্থাৎ, ক্রমশ কমতে থাকা হিন্দু জনসংখ্যার বিষয়ে কারুর কোনো রকম চিন্তা করাই উচিত নয়। হিন্দুদের সান্ত্বনা দেওয়া হয় এই বলে যে হিন্দুদের জনসংখ্যা মোটেই কমছে, বরং মুসলিমদের সংখ্যা একটু বেশি মাত্রায় বেড়েছে।

ইতিহাস থেকে শিক্ষা : কাশ্মীর উপত্যকা, উত্তরপ্রদেশের কৈরানা, কেরালার মালাবার, বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া পশ্চিমবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চল, অসমের জনজাতি-অধ্যুষিত এলাকাগুলি, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান, মায়ানমার ইত্যাদি রাজ্য, অঞ্চল ও দেশগুলি হলো হিন্দু জনসংখ্যা কমে যাওয়ার এক-একটি পরিণাম। জনসংখ্যাগত আধিক্য, জনবিন্যাসগত সংখ্যাগরিষ্ঠতার গুরুত্ব উপলব্ধি না করার পরিণতি বারবার আমাদের সামনে এসেছে। এই বিষয়টি সম্পর্কে কোনোরকম আলোচনা কিন্তু নিষিদ্ধ। অত্যন্ত সুচতুরভাবে এই বিষয়টিকে আলোচনার পরিধির বাইরে রাখা হয়ে থাকে। তথাকথিত সেকুলার, বড়ো মাপের একজন সাংবাদিক যিনি অন্য সাংবাদিকদের বিশ্বাসযোগ্যতা-নির্ভরযোগ্যতার মাপকাঠি নির্ধারণ করে থাকেন, লোকজনের জাত তুলে কথাবার্তা বলেও যিনি বেশ কুখ্যাত, তিনি সম্প্রতি একটি টেলিভিশন চ্যানেলের বিতর্কে প্রশ্ন তোলেন যে ভারতে হিন্দুদের সংখ্যা কমে গেলে কী এমন হবে? ভারত একটি মুসলিম বহুল দেশ হলে কী হয়ে যাবে? এটা কি এমন বড়ো ব্যাপার? এটা কি কোনো ইস্যু?

নিজস্ব সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রতি ঘৃণা পোষণ করা এই বিষাক্ত চিন্তাধারা— প্রশাসনিক ক্ষমতার ব্যবহার, রাজনৈতিক ভাঙাগড়ার কারসাজি ও দুনিয়া জুড়ে ছড়িয়ে থাকা আন্তর্জাতিক তন্ত্রের (সিস্টেমের) সাহায্যে বিগত বহু দশক যাবৎ প্রচারমাধ্যমকে কার্যত কুক্ষিগত করে রেখেছে এবং বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা ও গবেষণার কেন্দ্রগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে। এরা সেই ধরনের লোক যারা পাকিস্তান, বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর হয়ে চলা অত্যাচার, নিপীড়ন, ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ড বিষয়ক আলোচনা নিরর্থক মনে করে। এই দেশগুলিতে সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনায় নীরব থাকে। উদ্বাস্তু কাশ্মীরি হিন্দুদের পুনর্বাসন শিবির থেকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে দিতে সদা সক্রিয় থাকে, বর্তমান ভারতকে ১৯৪৭ সালে প্রচারিত 'আইডিয়া অব ইন্ডিয়া'-প্রসূত বলে দাবি করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই ভারত কি তার আধ্যাত্মিক-সাংস্কৃতিক পরম্পরা বিবর্জিত অন্য কিছু? হিন্দু জনসংখ্যা হ্রাসের অর্থ কেবলমাত্র একটি উপাসনা-পদ্ধতির অনুসরণকারীদের সংখ্যা কমে যাওয়া নয়। এই জনসংখ্যা হ্রাস— পরমতসহিষ্ণু, অসংখ্য উপাসনা-পদ্ধতি, মত ও পন্থার সমন্বয়সাধনকারী, সব মত ও পথকে সম্মান-স্বীকৃতিদানকারী সংস্কৃতির শেষ হয়ে যাওয়ার বিপদের লক্ষণ। ভারত জুড়ে বৈচিত্র্যের এই বর্ণালি, ভারতের এই বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য, ভারতের এই গণতান্ত্রিক চরিত্র, সহিষ্ণুতা— এইসব কিছুর অস্তিত্বের কারণ হলো ভারতের মধ্যে প্রোথিত হিন্দু সংস্কৃতি। এই সত্য হলো চরম সত্য, প্রশ্নাতীত, অনস্বীকার্য সত্য। এখানে কুযুক্তির অবতারণা করে ইওরোপের প্রসঙ্গও টেনে আনা হয়। ইওরোপীয় দেশগুলিতেও স্থানীয় জনসংখ্যার তুলনায় বহিরাগত মুসলমানদের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। ভারতের হিন্দু জনসংখ্যার হ্রাসপ্রাপ্তির মতোই ফ্রান্সে ফ্রেঞ্চ, জার্মানিতে জার্মানদের এবং ব্রিটেনে ব্রিটিশদের জনসংখ্যা তুলনামূলকভাবে হ্রাস পাচ্ছে, অভিবাসী, অনুপ্রবেশকারী মুসলিমদের সংখ্যা তীব্র হারে বাড়ছে। ইওরোপীয়দের জনসংখ্যার সঙ্গে ভারত ও ভারতের হিন্দুদের তুলনা করে বামপন্থী বুদ্ধিজীবীরা একে 'উন্নতি'-র পরিচায়ক বলে দাবি করেন। তাদের যুক্তি হলো উন্নতিশীল দেশগুলিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এমনিতেই কম হয়। এই কারণে তাদের মতে ভারতে হিন্দুদের এই জনসংখ্যা ভারতের উন্নতি ও প্রগতির লক্ষণ বলে মনে করা উচিত। প্রশ্ন হলো, ইওরোপ জুড়ে মুসলমানদের এই জনবিস্ফোরণকে কি ইওরোপীয়রা সেকুলারিজম-প্রসূত আধুনিকতা ও উন্নতির উদাহরণ বলে আদৌ মানেন? ইওরোপে একটা সময়ে অর্থনৈতিক উন্নতি ও প্রগতির লক্ষ্যে প্রয়োজন ছিল সস্তা শ্রমিক। সেই লক্ষ্যে এশিয়া ও আফ্রিকার নানা দেশ থেকে বিপুল সংখ্যায় মুসলমানরা ইওরোপের দেশগুলিতে প্রবেশ করতে থাকে। বহু দশক ধরে এই ঘটনা চলতে থাকায় এখন তারা গোটা ইউরোপ জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে, যার পরিণামে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মতো দেশে ব্রিটিশ ও ফ্রেঞ্চরাই কার্যত সংখ্যালঘু হয়ে পড়েছে।

(লেখক বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক)

টানা তৃতীয়বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকার জন্য গত ৪ জুন যখন এই এই প্রতিবেদন লিখছি, তখন লোকসভা ভোটের পুরো ফলাফল প্রকাশিত না হলেও নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদীই যে তৃতীয়বারের জন্য দেশে প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন তা নিশ্চিত। এবং তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্বের আমলে এবারই প্রথম সাংবিধানিকভাবে 'বিরোধী দল' পেতে চলেছে দেশ। কংগ্রেসই হচ্ছে সেই বিরোধী দল।

পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির ফল আশানুরূপ হয়নি। গত লোকসভা নির্বাচনের তুলনায় এরাজ্যে বিজেপি ভোট শতাংশ যেমন নিম্নমুখী হয়েছে, তেমনই আসন সংখ্যাও বেশ কিছুটা কমেছে। বলাবাহুল্য, দেশের ক্ষমতা দখল করলেও আপামর বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের জন্য এই ফল হতাশাব্যঞ্জক। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এই হতাশা কিন্তু ফার্স্ট বয়ের আরও ভালো ফল করতে না পারার হতাশা। পাশাপাশি এও মনে রাখতে হবে, এবারেও দেশের বৃহত্তম সংসদীয় দল বিজেপি। এবং একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলেও বিজেপি তার থেকে কিন্তু খুব দূরে নেই।

ইতিপূর্বে দশবছর দেশ শাসন করেছে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার। এই অবস্থায় প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার হাওয়া, যাকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিভাষায় অ্যান্টি ইনকামবেন্সি ফ্যাক্টর বলা হয়, তা কিন্তু বিজেপির বিপক্ষে গিয়েছে। এহেন অবস্থায় বিজেপির এবারের ফলাফল কিন্তু তাদের কর্মী-সমর্থকদের জন্য মোটেও হতাশাজনক নয়।

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদীর জনপ্রিয়তা আজও সংশয়াতীত। ভারতের নির্বাচনী ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যাবে, মোদী জমানার আগে শেষবার ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুর পর তাঁর প্রতি সহানুভূতির হাওয়াকে কাজে লাগিয়ে শেষবারের মতো কংগ্রেস একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছিল। তার আগে স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে ইন্দিরা গান্ধীর দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণার আগে কংগ্রেস বিরোধীহীনতার সুযোগে এককভাবে ক্ষমতায় আসত। জরুরি অবস্থার সময়ে জয়প্রকাশ নারায়ণ, মোরারজী দেশাইরা যেমন বিরোধীদের এককাট্টা করে নির্বাচনে অপরাজেয় কংগ্রেসকে হারিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন, তারপর অটলবিহারী বাজপেয়ীর হাত ধরে ক্ষমতা দখলের কৌশলে জোট-রাজনীতি প্রবেশ করে। কংগ্রেসও এই নীতি অনুসরণ করতে বাধ্য হয়

২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদী একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেও জোট-রাজনীতির ধর্ম মেনেই দশ বছর দেশ শাসন করেছেন। সংসদীয় গণতন্ত্রে শক্তিশালী বিরোধী সবসময়ই কাম্য। নরেন্দ্র মোদীও আফশোস করে বলেছিলেন, তিনি দশবছরে কোনো স্বীকৃত বিরোধী পাননি। কারণ বিরোধী দলের মর্যাদা পেতে গেলে মোট আসনের নূন্যতম এক দশমাংশ আসন পাওয়ার যোগ্যতা গত দুবারই অর্জন করতে পারেনি কোনো বিরোধী রাজনৈতিক দল। নরেন্দ্র মোদী ২০১৪ সালে ক্ষমতায় এসে কংগ্রেসি-চিন্তনমুক্ত ভারতের কথা, ভারতীয় রাজনীতিতে পরিবারতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কথা বলেছিলেন। আজ কংগ্রেসের নেতৃত্বে তাদের পারিবারিক সম্পত্তি মনে করা গান্ধী পরিবারের কোনো প্রতিনিধি নেই। তাই দেশের বিরোধী দলের মর্যাদা লাভে এই সাফল্য। যা হয়েছে তাতে দেশের গণতন্ত্রই উপকৃত হবে।

এখন রাজ্যে শাসক দলের পদলেহন ছেড়ে পুলিশ-প্রশাসনকে দেখতে হবে, নির্বাচন-পরবর্তী সন্ত্রাসে যেন কোনো নিরীহ প্রাণ অকালে ঝরে না যায়।

পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির বিপক্ষে তৃণমূলে নয় শতাংশ ভোট বেশি পাওয়া মানে এই নয় যে তৃণমূলের সব দুর্নীতি মিথ্যা হয়ে যাবে। তার মানে এই নয় যে রাজ্যের শাসক দলের তোষণের রাজনীতি, পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি রাজ্যের উপকার করবে। বসিরহাটে শাসক দলের প্রার্থীর বিপুল ভোটে জয়ের মানে এই নয় যে সন্দেশখালির হিন্দু মা-বোনেরদের ওপর যাবতীয় অত্যাচার ফিকে হয়ে যাবে। ডায়মন্ড হারবারে শাসক দলের প্রার্থীর বিপুল জয়ে বাম জমানায় আরামবাগের কথা মনে করাচ্ছে-- 'শ্মশানের শান্তিতে ভোটের ট্রাডিশন সমানে চলছে।' এখন রাজ্যে শাসক দলের পদলেহন ছেড়ে পুলিশ-প্রশাসনকে দেখতে হবে, নির্বাচন- পরবর্তী সন্ত্রাসে যেন কোনো নিরীহ প্রাণ অকালে ঝরে না যায়। □

ধুপগুড়িতে মন্দিরে আক্রমণ : প্রতিবাদের ওপর বুলডোজার চালাচ্ছে পুলিশ

ঘটনার পনেরো দিন পরেও ধুপগুড়ির বিস্তীর্ণ এলাকা পুরুষশূন্য। ন্যায্য বিচারের জন্য যারা প্রতিবাদ করতে পথে নেমেছিল তারা এখন পুলিশের ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে

একলব্য রায়

গত ১৭ ও ১৮ মে রাতে জলপাইগুড়ি জেলার ধুপগুড়িতে দুটি কালী মন্দির, একটি শিব মন্দির এবং একটি শনি মন্দিরে আক্রমণের ঘটনা ঘটে। মন্দির থেকে বিগ্রহ তুলে নিয়ে বাইরে ফেলে দেওয়া হয়েছে, মন্দির অপবিত্র করা হয়েছে। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই এই ভয়াবহ ঘটনা এলাকাবাসীর নজরে আসে। হিন্দু মন্দিরে মর্মান্তিক ও বর্বরোচিত হামলার কারণে স্থানীয় বাসিন্দারা ন্যায্যভাবে এই নির্মম আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন।

দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে ১৮ মে সকাল থেকে দফায় দফায় পথ অবরোধ হয়েছে ধুপগুড়িতে। বিক্ষোভ দেখায় এলাকাবাসী। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিশাল পুলিশ বাহিনী। পথ অবরোধকারীরা রেল লাইনে বসে পড়েও অবরোধ করে। ফলে ট্রেন চলাচলেও বিঘ্ন ঘটে। খবরের এই অংশটুকু সকলেরই জানা। মূল স্রোতের মিডিয়ার রিপোর্ট থেকে এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় ধুপগুড়ি মানুষের করা পোস্ট থেকে মন্দির তছনছ করার দৃশ্য এবং মানুষের বিক্ষোভ প্রতিবাদের দৃশ্য আমরা অনেকেই দেখেছি।

এর মধ্যে অনেক কিছুই প্রকাশ্যে আসেনি। বিক্ষোভ প্রতিবাদ স্তব্ধ করার জন্য পুলিশের অতি সক্রিয়তা, ধুপগুড়িতে জেহাদিদের বাড়বাড়ন্তের খবর, জেহাদিদের পালটা আক্রমণের হুমকি ইত্যাদি কোনো খবরই সামনে আসেনি। শুধু স্পর্শকাতর তকমা লাগিয়ে দিয়ে এত বড়ো একটি ঘটনা মিডিয়ায় একেবারেই না আসা কোনো স্বাভাবিক ঘটনা হতে পারে না। দায়িত্বশীল মিডিয়ার তথ্য পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে এবং দোষীদের বিচারের কাঠগড়ায় পৌঁছে দিতে প্রশাসনকে সাহায্য করে থাকে। কিন্তু ধুপগুড়ির মন্দির আক্রান্ত হওয়া এবং বিগ্রহ ভাঙা, দোষীদের গ্রেপ্তার হওয়া, ধুপগুড়ির সাধারণ মানুষের প্রতিক্রিয়া, প্রশাসনের ভূমিকা ইত্যাদি কোনো খবরই মিডিয়ায় আসেনি। না করলে নয় এমন পরিস্থিতিতে উত্তরবঙ্গ সংবাদ মিনমিন করে কিছু খবর করলেও ক্ষমতাসীন দলের আশ্রিত সাংবাদিক নামধারী কিছু জিহাদি নাকি আপত্তি করেছে। ওই একটিই অজুহাত, এতে উত্তেজনা ছড়াবে! পুলিশ শুধু সোশ্যাল মিডিয়ায় যারা পোস্ট করছে শুধু তাদের নয়, অন্য মিডিয়াকেও চাপ দিচ্ছে খবর না করতে। প্রশ্ন হচ্ছে, পুলিশকে মিডিয়ার টুটি টিপে ধরার অধিকার কে দিল? তাহলে মিডিয়ার জিহাদিরা কি পুলিশকেও নিয়ন্ত্রণ করছে? এতে উত্তেজনা বাড়ছে। পরিস্থিতি দ্রুত স্বাভাবিক হওয়ার বদলে আরও গরম হয়ে উঠছে।

ধুপগুড়ি কাণ্ডে মিডিয়ায় না আসা একটি খবর বোধহয় বিশ্লেষণ হওয়া প্রয়োজন। সেই খবরটি হচ্ছে সাংবাদিক নিগ্রহ। ১৮ মে যখন বিক্ষোভ আছড়ে পড়ে তখন ইলেকট্রনিক মিডিয়ার এক সাংবাদিককে উত্তেজিত জনতার হাতে নিগৃহীত হতে হয়। এই নিয়ে সাংবাদিক মহলে ক্ষোভ-বিক্ষোভ ছড়ালেও বিষয়টি নিয়ে কেউ খবর করতে সাহস করেনি।

সাংবাদিক নিগ্রহ নতুন কোনো বিষয় নয়। ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী, স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর যখন বেআব্রু হওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয় তখন মিডিয়ার উপর আক্রমণ হয়। সেই আক্রমণ অনেক সময় প্রাণঘাতীও হয়। মানুষ আঁতকে ওঠে, শিউরে ওঠে। এই ধরনের আক্রমণের ঘটনায় নাগরিক সমাজের সহানুভূতি মিডিয়ার বা সাংবাদিক বন্ধুদের সঙ্গেই থাকে। কিন্তু ধুপগুড়ির ঘটনাটি সম্পূর্ণ বিপরীত। এখানে পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে যেমন মানুষের ক্ষোভ আছড়ে পড়েছিল, ঠিক তেমনি মিডিয়ার ভূমিকার বিরুদ্ধেও মানুষের সমান ক্ষোভ তৈরি হয়েছিল।

ধর্ম ও সংস্কৃতির উপর আক্রমণের ঘটনা যখন ঘটে তখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে মানুষ রাস্তায় নামেন, প্রতিবাদে শামিল হন। ধুপগুড়িতে সেদিন বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে এই বিক্ষোভ প্রতিবাদ সংঘটিত হয়েছিল। প্রতিবাদের ধরন দেখেই বোঝা গেছে যেই প্রতিবাদ পূর্বপরিকল্পিত, সংগঠিত প্রতিবাদ ছিল না। যে যেমন পেরেছে সে তেমন ভাবেই প্রতিবাদে শামিল হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখা গেছে যে প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তার সুযোগ

নিয়ে একটি এলাকায় এক শ্রেণীর মানুষ থানা মোড়ের মসজিদকে লক্ষ্য করে ঢিল ছুড়ছে, বন্ধ গেটে, টিনের বেড়ায় লাথি মারছে। সোশ্যাল মিডিয়ার ওই ভিডিয়োতে যা দেখা গেছে তাতে এই উত্তেজিত জনতাকে শান্ত করার জন্য প্রশাসনের উপস্থিতি দেখা যায়নি। স্থানীয় মানুষের বক্তব্য অনুসারে হিন্দু এলাকায় এই মসজিদ আক্রমণের জন্য প্ররোচনা জুগিয়ে উসকানি দিয়ে পরিস্থিতি বেগতিক হয়ে উঠার পর উসকানি দাতারা কেউ মসজিদে আশ্রয় নিয়েছে, আবার অনেকে অন্যত্র পালিয়ে গিয়েছে। ঘটনার অনেক পরে সেখানে পুলিশ উপস্থিত হয়েছে। অর্থাৎ এই ঘটনাটি ঘটতে দেওয়া হয়েছে। উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়তে দেওয়া হয়েছে। যাতে মূল ঘটনা থেকে সবার দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়া যায়। সকাল থেকে ক্ষোভ-বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়তেই সবার আগে পুলিশের কর্তব্য ছিল মাদ্রাসা, মসজিদগুলোর সুরক্ষা নিশ্চিত করা। কিন্তু পুলিশ তা করেনি। অর্থাৎ এগুলোকে কেন্দ্র করে ক্ষোভ বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ার ক্ষেত্রেও পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা অনেক বড়ো কারণ।

যে সমস্ত এলাকায় শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ সংগঠিত হচ্ছিল সেখানেও সময়োপযোগী পদক্ষেপের অভাবে প্রতিবাদী মানুষের ক্ষোভ বারবার আছড়ে পড়ছিল প্রসাসনের বিরুদ্ধে। কারণ প্রশাসন অপরাধীদের গ্রেপ্তার করার তৎপরতা দেখানোর বা মানুষকে আশ্বস্ত করার চেয়ে, শান্তিপূর্ণভাবে অবরোধ আন্দোলনে শামিল প্রতিবাদীদের দিকে চোখ রাঙাতেই বেশি ব্যস্ত ছিল। শান্তিপূর্ণ অবরোধ আন্দোলনে প্রতিবাদীদের ভয় দেখানোর জন্য কাঁদানে গ্যাস-সহ দাঙ্গা দমনে ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত পুলিশবাহিনীর উপস্থিতি, পুলিশের তরফে বিক্ষোভকারীদের প্রতিটি আচরণের ভিডিয়োগ্রাফি করার অতি সক্রিয়তা স্থানীয় মানুষকে আরও বেশি বিক্ষুব্ধ ও অশান্ত করে তোলে। পুলিশের সঙ্গে সঙ্গে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারীদের উপর একশ্রেণীর মিডিয়ার নজরদারির অপপ্রয়াসও মানুষের দৃষ্টি এড়ায়নি। এক শ্রেণীর মিডিয়ার এই নজরদারি করার মতো শারীরিক ভাষা বিক্ষোভ স্থলে সেই মিডিয়ার বন্ধুদেরও মনে হচ্ছিল যেন ওরা হিন্দু সমাজের বিচারের দাবিকে নয়, বিক্ষোভকারীদের ভুল ত্রুটি বা ভিড়ের মধ্যে বেফাঁস মন্তব্যগুলি ভিডিয়ো করতে বেশি আগ্রহী। ওদের গতিবিধি আচার- আচরণ দেখে অনেকেরই মনে হচ্ছিল ওরা যেন খবর করার জন্য নয়, বিক্ষোভকারীদের ফাঁসাতে পুলিশের হয়েই ভিডিয়োগ্রাফি করছে। স্বাভাবিকভাবেই মিডিয়ার বন্ধু দের শারীরিক ভাষা ও আচার-আচরণ অবশেষে বিক্ষোভকারীদের ক্ষিপ্ত করে তোলে যার পরিণামে শারীরিক নিগ্রহের ঘটনা ঘটে।

মিডিয়ার বন্ধুদের উপর এই নিগ্রহের ঘটনা কোনোভাবেই সমর্থন যোগ্য নয়। তবে যেটা আশঙ্কার কথা সেটা হলো যে প্রশাসনকে যেমন মানুষ সন্দেহের চোখে দেখে ঠিক তেমনি আজকাল মিডিয়াকেও সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করেছে। ধুপগুড়িতে সাংবাদিক নিগ্রহের ঘটনা এটাই প্রমাণ করে। মিডিয়ার ভাবমূর্তিও পুলিশ প্রশানের মতোই পক্ষাপাত দুষ্ট।

একশ্রেণীর মিডিয়ার ক্ষমতাসীনদের পদলেহনকারী ভূমিকার জন্য আজ সমগ্র মিডিয়া জগৎকেই সন্দেহের তালিকা ভুক্ত করে দিয়েছে। এখন মূল স্রোতের মিডিয়ায় পরিবেশিত কোনো খবর বা তথ্য মানুষ সোশ্যাল মিডিয়ায় যাচাই করে নেয়। তাছাড়া সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে এখন সাংবাদিক হতে গেলে কোনো প্রশিক্ষণ বা পড়াশোনা কিছুই লাগে না। একটি মোবাইল থাকলে সাংবাদিক হওয়া যায়। সামান্য প্রযুক্তিগত জ্ঞান সম্বল করে ফেসবুক পেজ কিংবা ইউটিউব চ্যানেল খুলে নিয়ে নিউজ পোর্টাল চালাচ্ছে এরকম অজস্র উদাহরণ রয়েছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বা বিভিন্ন নেতারা সামান্য পয়সা দিয়ে এরকম পোর্টাল খুলে খবরের নামে প্রোপাগান্ডা ছড়াচ্ছে, মিথ্যে ভাবমূর্তি তৈরি করছে। যার ফলে সাধারণ মানুষও বিভ্রান্ত হয়ে পড়ছে। কোনটা খবর আর কোনটা প্রোপাগাণ্ডা এটা এখন বোধহয় সাধারণ মানুষের পক্ষে বোঝা খুবই কঠিন। কারা সাংবাদিক আর কারা অ্যাক্টিভিস্ট এই তফাত করাটাও বোধহয় এখন খুবই কঠিন কাজ। সোশ্যাল মিডিয়া যেমন একদিকে প্রভাবশালী মিডিয়া হাউজগুলোর একাধিপত্যকে চুরমার করে দিয়েছে, তেমনি অন্যদিকে ফেক নিউজ বা অ্যাক্টিভিজমের ক্ষেত্রটাও অনেক বেশি প্রসারিত করে দিয়েছে।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার চারটি অংশ— লেজিসলেটিভ, এক্সিকিউটিভ, জুডিশিয়ারি ও মিডিয়া। এই চারটি অংশই সঠিক ভাবে কাজ করলে একটা সুস্থ সমাজ ব্যবস্থা তৈরি হতে পারে। লেজিসলেটিভ অংশটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত। রাজনৈতিক ব্যবস্থা এখন সর্বগ্রাসী রূপ নিয়েছে। বকলমে বাকি তিনটিকে নিয়ন্ত্রণ করছে। এক্সিকিউটিভ অর্থাৎ প্রশাসনের পুরো নিয়ন্ত্রণ এখন ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের হাতে। বিচার ব্যবস্থার কোনো রায় পছন্দ না হলে রাজনীতিবিদরা বিচার ব্যবস্থাকে পর্যন্ত হেনস্থা করে ছাড়ছেন। মিডিয়ার তো কোনো কথাই নেই। ক্ষমতার প্রভাবে, অর্থের প্রভাবে মিডিয়ার লোকেদের ম্যানেজ করতে কতক্ষণ। এছাড়াও অর্থের জোরে সাংবাদিক

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার যে সকল বার্ষিক গ্রাহকের মেয়াদ শেষ হয়েছে বা শেষ হতে চলেছে তাঁদের কাছে বিনীত নিবেদন, আপনারা পরবর্তী বছরের জন্য গ্রাহকমূল্য ৭০০ টাকা অবিলম্বে জমা দিয়ে গ্রাহকপদ নবীকরণের মাধ্যমে আমাদের সহযোগিতা করুন। স্বস্তিকার প্রতিনিধির মাধ্যমেও টাকা পাঠাতে পারেন। নতুন গ্রাহক হলে সম্পূর্ণ নাম- ঠিকানা, ফোন নম্বর (পিন কোড সহ) অবশ্যই পাঠাবেন।

ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

নামধারী অ্যাক্টিভিস্ট দিয়ে নিজেদের প্রোপাগাণ্ডা মেশিনারি তৈরি করে নিজেদের আখের গোছাচ্ছে।

ধুপগুড়ির সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা নিয়ে মিডিয়ার অনেক বন্ধুর মনোভাব জানা গেয়েছে। প্রত্যেকের বক্তব্য, প্রশাসন থেকে কোনোভাবেই ধুপগুড়ির পরিস্থিতি নিয়ে খবর করতে দেওয়া হচ্ছে না। এলাকার ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় কোনো খবর আপলোড করলে সেটা মুছে দিতে বাধ্য করা হচ্ছে। ধুপগুড়ির অশান্তি নিয়ে খবর করলে নাকি পরিস্থিতি আরও ঘোরালো হয়ে উঠতে পারে। আপাতদৃষ্টিতে প্রশাসনের এই পদক্ষেপ সঠিক মনে হলেও এর মধ্যে এক ভয়ানক প্রবণতা লুকিয়ে রয়েছে যা এখন ধুপগুড়ির মানুষ টের পাচ্ছে। ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ রাখার পক্ষে হয়তো কিছুটা যুক্তি আছে। কারণ সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে যাতে সাধারণ মানুষ উত্তেজনা ছড়াতে না পারে সেজন্য সাময়িকভাবে এই ধরনের ব্যবস্থা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কিন্তু মূল স্রোতের মিডিয়াকে কভার করতে না দেওয়া একটা ভয়ানক প্রবণতা। উত্তেজনা প্রশমন করতে প্রশাসনের যেমন যায়িত্ব আছে তেমনি মিডিয়ার দায়িত্বও কম নয়। মন্দিরের মূর্তি ভাঙার ক্ষেত্রে দোষীরা হয়তো মুসলমান, তার মানে এই নয় সমস্ত মুসলমান সমাজ এটাকে সমর্থন করছে। অবশ্য মুসলমান সমাজের সজ্জন অংশের নীরবতাও এই ধরনের জেহাদি ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে সমস্ত মুসলমান সমাজের জড়িয়ে যাওয়ার ন্যারেটিভ তৈরি করতে সহায়তা করে।

কিন্তু বাস্তবে জেহাদি ক্রিয়াকলাপের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ যেমন সরাসরি মুখ খুলতে ভয় পায়, তেমনি মুসলমান সমাজের সজ্জন অংশও এদের ভয়ে নীরব হয়ে থাকে। প্রশাসনের প্রথম কর্তব্য মুসলমান সমাজের এই জেহাদি অংশকে সবার থেকে বিচ্ছিন্ন করা। কারণ জেহাদি অংশকে বিচ্ছিন্ন করা গেলে এদের দ্রুত বিচারের আওতায় এনে সাধারণ মানুষের আস্থা অর্জন করা যেতে পারে। এই বিচ্ছিন্নকরণের কাজে সবচেয়ে বড়ো সহায়ক হয়ে উঠতে পারে মিডিয়া। প্রশাসনের দাদাগিরি দিয়ে সেই মিডিয়ার হাত-পা বেঁধে দেওয়ার ফলে সমস্যার উপর প্রলেপ পড়লেও সমস্যার স্থায়ী সমাধান হয় না। ধুপগুড়ি কাণ্ডেও ঠিক তাই হয়েছে। যারা হিন্দু মন্দির অপবিত্র করলো, বিগ্রহ ভাঙচুর করলো, তাদের গ্রেপ্তার করার ব্যাপারে পুলিশ কতটা সক্রিয় এই প্রশ্ন কিন্তু সর্বত্রই উঠছে। শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদীদের নামে মামলা দায়ের করে পুলিশ এখন তাদের গ্রেপ্তার করার জন্যই সর্বশক্তি নিয়োগ করছে। এতে হয়তো উত্তেজনাকে ধামাচাপা দেওয়া যাবে কিন্তু উত্তেজনা নির্মূল করা যাবে না। সমস্যার গোড়ায় যাওয়া কখনই সম্ভব নয়।

রাজ্য সরকারের বকলমে তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত প্রশাসনের তোষণের মানসিকতা, ভোটব্যাংকের বিকৃত ভাবনাই জেহাদিদের দিনের পর দিন শক্তিশালী করে তুলছে। তৃণমূল কংগ্রেসের মতো দুর্নীতিপরায়ণ দলের দৃষ্টিতে সাধারণ মুসলমান সমাজ আর জেহাদিদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। কট্টরপন্থীদের বিচারের কাঠগড়ায় এনে শাস্তির মুখোমুখি দাঁড় করাতে বড়ো বাধা ক্ষমতাসীন দলের তোষণ নীতি, ভোটব্যাংকের রাজনীতি। স্বাভাবিকভাবেই এরা শক্তি সঞ্চয় করে পরবর্তীতে আরও আঘাত হানার জন্য তৈরি হওয়ার সুযোগ পেয়ে যায়।

ধুপগুড়িতে ঠিক তাই হয়েছে। হিন্দুদের প্রতিবাদ প্রতিরোধের পর ডুয়ার্সের কিছু উগ্রপন্থী মুসলমান সংগঠনও পালটা হানার প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছিল। পুলিশের বড়ো বড়ো কর্তারা তখন ধুপগুড়িতে উপস্থিত। এই পরিস্থিতিতে ঘটনার একদিন পর ১৪৪ ধারা অমান্য করে দূরদূরান্ত থেকে আসা শয়ে শয়ে জেহাদি মুসলমান আক্রমণ করার জন্য চামড়া গোডাউন এবং ১৬ নং ওয়ার্ডে জমায়েত হয় কী করে? সেদিন হিন্দু মা-বোনেদের সম্মিলিত প্রতিরোধ না থাকলে ধুপগুড়ি ১৬নং ওয়ার্ডের স্টেশন মোড় সংলগ্ন এলাকাতে করে এরা বড়ো কোনো অঘটন ঘটিয়ে ফেলতে পারতো। শোনা যায় এদের হঠাতে পুলিশও নাকি টিআর গ্যাসের শেল ফাটিয়েছে। দুষ্কৃতীদের আক্রমণে পুলিশও আহত হয়েছে। তা সত্ত্বেও আক্রমণ হয়েছে মিতালি রায়ের বাড়ি ও পেট্রোল পাম্পে। এই হামলার ঘটনায় কতজন গ্রেপ্তার হয়েছে তার স্পষ্ট না হলেও মিতালি রায় ও তার ভাইকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে জামিন আযোগ্য ধারায়। মিতালি ছাড়াও গোলমাল করা এবং পুলিশের উপরে হামলার অভিযোগে ১৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতদের মধ্যে চার জনকে পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। বাকিদের জেল হেফাজতে পাঠানো হয়েছে। মিতালির পক্ষের আইনজীবী গৌতম দাস বলেন, 'মিতালি রায় ও মৃণাল রায়কে ধুপগুড়ি থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করে আদালতে পাঠিয়েছে। জামিন-অযোগ্য একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। মিথ্যা মামলায় উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে তাঁদের ফাঁসানো হয়েছে।' এদিন আদালতের এক মুহুরির মৃত্যুর কারণে কোনও আইনজীবী সওয়াল করেননি। মিতালি ও মৃণাল নিজেরাই জামিনের আবেদন করেছিলেন।

মূল অপরাধীদের ধরতে না পারলেও প্রতিবাদীদের ওপর যে নির্বিচারে পুলিশ নির্যাতন চলছে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ঘটনার পনেরো দিন পরেও ধুপগুড়ির বিস্তীর্ণ এলাকা পুরুষশূন্য। ন্যায্য বিচারের জন্য যারা প্রতিবাদ করতে পথে নেমেছিল তারা এখন পুলিশের ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। এই লেখা শেষ করা পর্যন্ত ধুপগুড়ির নাগরিক সমাজের বিভিন্ন অংশ থেকে শান্তি মিছিল করার চেষ্টা হলেও ক্ষমতাসীন দল ও প্রশাসনের বিরোধিতার কারণে জন্য তা করা হয়ে ওঠেনি। পুলিশ ১৪৪ ধারা জারি করেছে। তার মধ্যে হাট বাজার সব কিছুই চলছে কিন্তু পরিস্থিতি শান্ত করার জন্য নাগরিক সমাজকে সক্রিয় হতে দেওয়া হচ্ছে না।

মিডিয়ার মুখ বন্ধ করা আছে, সুতরাং পুলিশ নিশ্চিন্ত মনে প্রতিবাদীদের ওপর বুলডোজার চালালেও এই বিষয়ে প্রতিবাদ করার কেউ নেই। ভোটের ফলাফল ঘোষণার পর লাগাম ছাড়া হিংসার আশঙ্কায় থরথর করে কাঁপছে গোটা পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে ধুপগুড়িও। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আগাম পুলিশি সন্ত্রাস। □

সামাজিক ন্যায় বনাম তোষণ নীতি
পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক প্রেক্ষিত

পল্লব মণ্ডল

২০১০ সালের পরে তৈরি হওয়া সমস্ত ওবিসি শংসাপত্র বাতিল করার এবং এই তালিকা অবৈধ বলে ঘোষণা করার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। এর ফলে বাতিল হতে চলেছে প্রায় ৫ লক্ষ ওবিসি শংসাপত্র। যদিও ২০১০ সালের আগের ঘোষিত ওবিসি শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিদের শংসাপত্র বৈধ এবং ২০১০ সালের পর ওবিসি সংরক্ষণের কারণে যারা চাকরি পেয়েছেন বা নিয়োগ প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছেন তাদের চাকরি বহাল থাকবে। শুনানি শেষে কলকাতা হাইকোর্ট স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, বর্তমান সরকারের শাসনকালে জারি হওয়া সমস্ত ওবিসি তালিকা বাতিল করা হলো। সেইসঙ্গে, ওবিসিদের জন্য ওয়েস্ট বেঙ্গল ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস কমিশন অ্যাক্ট ১৯৯৩ অনুযায়ী নতুন তালিকা তৈরি করতে হবে। সেই তালিকা বিধানসভায় পেশ করে চূড়ান্ত অনুমোদন নেওয়ার পরই এই তালিকা চূড়ান্ত বলে গণ্য করা হবে। তৃণমূলের 'ধর্মনিরপেক্ষতার' বুলি নস্যাৎ করে দেওয়া হাইকোর্টের এই সিদ্ধান্তের কথা শুনে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর রাজনৈতিক সমাবেশে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন।

হাইকোর্টের এই সিদ্ধান্ত পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের মধ্যে আনন্দের দৃশ্যমানতা মুখ্যমন্ত্রীর মুসলমান প্রীতিতে কিছুটা আঘাত হেনেছে বলেই মনে হয়। তাই তিনি মুসলমান তুষ্টীকরণের জন্য আদালতের আদেশের বিরুদ্ধে উচ্চতর আদালতে যাওয়ার কথা বলেন, যা সম্পূর্ণরূপে জাতিভিত্তিক সংরক্ষণকে রাজনৈতিক তুষ্টির জন্য ব্যবহার করার নজির। ২০১১ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকে তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে মুসলমান ভোটারদের সন্তুষ্ট করতে ওবিসি সংরক্ষণকে কারচুপি করার অভিযোগ রয়েছে। মুসলমান ভোটারদের মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর দল প্রধান ভোটব্যাংক বলে মনে করেন। পশ্চিমবঙ্গে তাদের জনসংখ্যা ৩০ শতাংশের বেশি। সুতরাং সংখ্যাগুরুত্বের দাবিদার দ্বিতীয় এই সম্প্রদায় কীভাবে সংখ্যালঘু স্ট্যাটাস ভোগ করে তা একটি বড়ো প্রশ্ন।

অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রী প্রায়শই বাংলাদেশ ও মায়ানমার থেকে আসা অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের উৎসাহ প্রদান এবং তাদের স্থায়িত্ব প্রদান করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন যা ভারতের সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় নিরাপত্তার পক্ষে হানিকারক। এ থেকেই বোঝা যায় যে, পদক্ষেপটি প্রকৃত সামাজিক ও অর্থনৈতিক পশ্চাদপদতা দূর করার পরিবর্তে তৃণমূলের ভোটব্যাংককে শক্তিশালী করার একটি নির্লজ্জ প্রচেষ্টা। ফলস্বরূপ, ক্ষমতাসীন দলের ২০১২ সালে প্রণীত নীতিটি কেবল সংরক্ষণের ইতিবাচক দিককেই ক্ষুণ্ণ করে না, সেই সঙ্গে এটি হিন্দু সমাজের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আচরণকেও ইন্ধন জোগায়, যাদের প্রকৃতপক্ষে এই সংরক্ষণের প্রয়োজন। তাই, মুসলমান সম্প্রদায়কে ওবিসি মর্যাদা দান বর্তমান রাজ্য সরকারের সামাজিক ও শিক্ষাগত পশ্চাদপদতার ভিত্তিতে সাংবিধানিক

সংরক্ষণের অপব্যবহার। কলকাতা হাইকোর্ট এই রায়দানের মাধ্যমে প্রমাণ করে দিয়েছে যে, সরকার পরীক্ষানিরীক্ষা বা সমীক্ষা ছাড়াই ওবিসিদের উপশ্রেণীবিন্যাসের সুপারিশ করেছিল। রাজ্য কমিশন এবং রাজ্য সরকার জনসাধারণের বিজ্ঞপ্তি ও আপত্তির উপর কর্ণপাত না করে এবং প্রয়োজনীয় পদ্ধতিগুলিকে উপেক্ষা করে সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটিকে অস্বচ্ছ ও পক্ষপাতদুষ্ট করে তোলে শুধুমাত্র মুসলমান তোষণের অভিপ্রায়ে। আদালত জানায় যে রাজ্য সরকারের সংরক্ষণ প্রদান সম্পর্কে সংবিধানের ১৬ (৪) অনুচ্ছেদে বর্ণিত নীতিগুলি মেনে চলা উচিত, যা সরকার উপেক্ষা করেছে।

কেন হিন্দু রিজার্ভেশন ভাগ করা হলো অবৈধ ভাবে?

এই রায় থেকে উদ্ভূত মৌলিক প্রশ্নগুলির মধ্যে একটি হলো কেন হিন্দু বর্ণ-ভিত্তিক সংরক্ষণ মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে কার্যত বিলিয়ে দেওয়া হলো? সামাজিক ও শিক্ষাগতভাবে পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর উন্নতির জন্য সংরক্ষণের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। তবে সংরক্ষণ রাজনৈতিক তোষণের হাতিয়ার হয়ে উঠল কেন? এই দুই প্রশ্নের ব্যাখ্যা দীর্ঘ আলোচনাসাপেক্ষ হলেও অতি সরলীকৃত উত্তর হলো রাজনৈতিক দলের ভোটব্যাংক দখলের মাধ্যমে নিজেদের ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখার লিপ্সা, যা তুষ্টিকরণের দ্বারাই সম্ভব। এই ক্ষমতা লিপ্সাই তৃণমূলকে ২০১২ সালের আইন দ্বারা মুসলমানদের ওবিসি সংরক্ষণের পথকে সুগম করে তলে, যা আসলে তাদের ভোটব্যাংক দখলের চেষ্টা মাত্র। মুসলমান ও খ্রিস্টানরা নিজেদের এমন একটি সম্প্রদায় বলে দাবি করে যারা বর্ণপ্রথা মেনে চলে না। তাদের সংখ্যালঘু কোটা বা অর্থনৈতিক ভাবে পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর কোটা আগে থেকে থাকলেও কোনো কোনো রাজনৈতিক দল এই সম্প্রদায়গুলিকে ওবিসি মর্যাদা দাবি করার অনুমতি দিচ্ছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি সংরক্ষণের মূল উদ্দেশ্যকে দুর্বল করে দেয়। অধিকন্তু, এটি সংবিধান দ্বারা প্রদত্ত তাদের ন্যায্য সুবিধা থেকে যোগ্য হিন্দু সমাজকে বঞ্চিত করে।

যোগ্যতার উপর রাজনৈতিক তুষ্টীকরণ?

তৃণমূল এবং ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক ইনক্লুসিভ অ্যালায়েন্সর দলগুলি সংখ্যালঘুদের ওবিসি কোটায় অন্তর্ভুক্ত করে তাদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে। তাদের ইশতেহারগুলি সরাসরি একথা না বললেও তাদের সমস্ত কর্মকাণ্ড তাদের এই অভিপ্রায়কে স্পষ্ট করে দিয়েছে। কর্ণাটকে সিদ্ধারামাইয়া প্রশাসনের সাম্প্রতিক পদক্ষেপগুলি তাদের এই অভিপ্রায়কে স্পষ্ট করে দিয়েছে। সিদ্ধারামাইয়া প্রশাসনের সাম্প্রতিক পদক্ষেপগুলি দেখলে বোঝা যাবে এই দলগুলি সমাজের নিপীড়িত অংশের সুবিধার জন্য সংবিধানে রাখা সংরক্ষণ ব্যবস্থার অপব্যবহার করছে। তারা অহিন্দু সম্প্রদায়কে ওবিসি তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে প্রকৃত ওবিসিদের সংরক্ষিত আসন ও কর্মসংস্থান থেকে বঞ্চিত করছে। ক্রমেই প্রকাশ হচ্ছে, ওবিসি কোটা সরকারি কর্মসংস্থান ও শিক্ষায় যোগ্যতাভিত্তিক ব্যবস্থাকে পাশ কাটিয়ে অন্যদের অনুমতি দেওয়ার একটি কৌশল হয়ে উঠেছে। অহিন্দু সম্প্রদায়গুলির ওবিসি মর্যাদা প্রতারিত করে রাজ্য সরকারগুলি যোগ্যতার পাশাপাশি সামাজিক ন্যায়বিচারের নীতিগুলিকে অবজ্ঞা করছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি কেবল জনসাধারণের আস্থা নষ্টই করে না, ভবিষ্যতে গ্রহণযোগ্য নীতিগুলির জন্য একটি বিপজ্জনক নজিরও স্থাপন করছে।

কলকাতা হাইকোর্টের রায় বর্তমান রাজ্য সরকার এবং ক্ষতিকর তুষ্টিকরণের রাজনীতি করা সমস্ত রাজনৈতিক দলের জন্য একটি সাবধান বাণী হওয়া উচিত। জনাদেশ ম্যান্ডেট নিয়ে ক্ষমতায় আসা রাজনৈতিক দলগুলিকে সমাজের কিছু অংশকে সন্তুষ্ট করার জন্য অবিচারের পথ অবলম্বন করতে দেওয়া উচিত নয়। রাজ্য সরকারগুলিকে অবশ্যই সমস্ত সম্প্রদায় ও জাতির সর্বোত্তম স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করতে হবে। পক্ষপাতদুষ্ট নীতি এবং রাজনৈতিক দুরভিসন্ধি কেবল সামাজিক কাঠামোর ক্ষতিসাধন ঘটাবে। যে সরকার এই ধরনের বিপজ্জনক নীতি গ্রহণ করছে, তারা ভারতের জনগণের সঙ্গে ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িক খেলা খেলছে। কলকাতা হাইকোর্টের সিদ্ধান্ত ভারতের হিন্দুদের সঙ্গে হওয়া মারাত্মক ভুল সংশোধন করেছে, এই সিদ্ধান্তে হিন্দুরা আনন্দিত।

আশা করা যায় এই পদক্ষেপ পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে পক্ষপাতদুষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি পুনর্বিবেচনা করতে বাধ্য করবে। সবশেষে, কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী এবং রাজশেখর মান্থার রায়টি মনে করিয়ে দেয় যে, ভারতে হিন্দুদের অধিকারের বিনিময়ে রাজনৈতিক তোষণের ঘটনা সংবিধান বিরুদ্ধ। □

বিশ্বাসঘাতকতার পরম্পরায় বাঙ্গালি হিন্দুজাতি দিশাহারা

চন্দন রায়

আমরা পূর্ববঙ্গের নির্যাতিত অত্যাচারিত, বিতাড়িত ভারতে আশ্রিত বাঙ্গালি উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গবাসী তথা ভারতবাসী। গভীরভাবে লক্ষ্য করছি পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে পাকপন্থী জেহাদি অধ্যুষিত এলাকায় হিন্দুদের দৈনন্দিন জীবন, মা-বোনেদের সম্ভ্রম, বিষয় সম্পত্তি, জান-মান সবই জেহাদি আগ্রাসনের শিকার। পূর্ববঙ্গ ও পাকিস্তানের চেয়েও ভয়ংকর। পূর্ববঙ্গ ও পাকিস্তানে অত্যাচার ও নির্যাতন সহ্যসীমা অতিক্রম করলে হিন্দুরা রাতের অন্ধকারে ভারতে আশ্রয় নিচ্ছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালি হিন্দুরা কোথায় আশ্রয় নেবে? তারা আজ পশ্চিমবঙ্গের বদ্ধভূমিতে অবরুদ্ধ। ভিটেমাটি, জমিজমা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হারা, এমনকী স্বাধীন ভোটাধিকার প্রয়োগ থেকে তারা বঞ্চিত ও লাঞ্ছিত। এখন প্রশ্ন, পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালি হিন্দুদের এই করুণ অসহনীয় দুরবস্থার জন্য দায়ী কারা? পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু বাঙ্গালি জাতিকে এর উত্তর দেওয়ার সময় এসেছে।

আমাদের প্রিয় ভারতমাতাকে প্রায় হাজার বছরের বিদেশি শাসন থেকে মুক্ত করার জন্য সর্বপ্রথম আপামর বাঙ্গালি হিন্দু কৃষক-শ্রমিক ছাত্র-শিক্ষক, নারী-পুরুষ, ধনী-দরিদ্র সকলে পরিবার বিষয় সম্পত্তির মায়া ত্যাগ করে এমনকী ফাঁসির মঞ্চকে তুচ্ছজ্ঞান করে ভারতমাতার শৃঙ্খল মুক্ত করার অসম লড়াইয়ে আত্মবলিদান করেছিল। ভারতবাসীকে স্বাধীনতার মন্ত্রে জাগ্রত করেছিল এই অভিশপ্ত বাঙ্গালির পূর্বপুরুষেরা। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, ভারতের স্বাধীনতার শেষলগ্নে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট গভীর চক্রান্তের শিকার বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো হিন্দু বাঙ্গালির উপর মৃত্যু পরোয়ানা নেমে এলো, ভারত ভাগ হলো, বঙ্গ ভাগ হলো।

বাম-কংগ্রেসের প্রথম বিশ্বাসঘাতকতা :

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট, বাম-কংগ্রেসের প্রথম বিশ্বাসঘাতকতার বীজ বঙ্গের মাটিতে বপন হলো। বাম-কংগ্রেস জোট ও তাদের পেয়ারের দোসর মুসলমান ও ইংরেজ জোট ভারত ভূমিকে ভাগ করলো কিন্তু পঞ্জাবের মতো লোক বিনিময় করে ভারতভূমিতে সসম্মানে বাঙ্গালিজাতিকে পুনর্বাসন করা হলো না। তার পরিবর্তে আগত হিন্দু বাঙ্গালি জাতির সঙ্গে বাম ও কংগ্রেস বিমাতাসুলভ আচরণ করে তাদের ভারতীয় নাগরিকত্বের অধিকার থেকে বঞ্চিত করলো। তাদের আমৃত্যু লালিত ভারতীয়ত্বকে হত্যা করে কপালে তাদের শরণার্থী তকমা গেঁথে দিল। পাকিস্তানি জেহাদি নেকড়েদের হাতে অর্পণ করলো। পাকিস্তানি জেহাদিরা হিন্দুদের আখ্যায়িত করলো শত্রু বলে। ফলে হিন্দুদের বিষয়সম্পত্তি শত্রু সম্পত্তি হিসেবে আইনি স্বীকৃতি পেল। কাফের হিন্দু জাতির মা, বোন, বিষয় সম্পত্তি গনিমতের মাল হিসেবে দেখা হলো। ইসলাম অবমাননার অজুহাতে যখন খুশি লুটপাট, অগ্নিসংযোগ হত্যা ও মা-বোনেদের সম্ভ্রম ও ইজ্জত হরণ করা তাদের অধিকার পরিণত হলো যা ১৯৪৬, ১৯৫২, ১৯৫৭, ১৯৬৪, ১৯৬৯, ১৯৭১, ১৯৮০, ১৯৯০, ২০০৪, ২০২০ সাল সাক্ষী হিসেবে রয়েছে। যা আজও প্রতিনিয়ত রুটিনে পরিণত হয়ে গেছে। বিদেশি ধ্যান ধারণায় মগ্ন কমিউনিস্ট ও কংগ্রেস আরবীয় সংস্কৃতিতে ললিত ১০ শতাংশ জেহাদি মানসিকতায় পুষ্ট মুসলিম লিগের কাছে আত্মসমর্পণ করে নতজানু হয়ে ভারত ভাগ করেছিল। সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু বাঙ্গালি জাতির উপর নেমে এলো এক ভয়ংকর অভিশাপের কালো মেঘ। শরণার্থী বাঙ্গালি জাতি বিশ্বে এক ভূমিহীন জাতিতে পরিণত হলো। হিন্দুদের জীবনে বিভীষিকাময় পরিণতির দায় কমিউনিস্ট ও কংগ্রেসের বিশ্বাসঘাতকরা অস্বীকার করতে পারবে না। ইতিহাস কখনও তাদের ক্ষমা করবে না।

বাম-কংগ্রেসের দ্বিতীয় বিশ্বাসঘাতকতা :

ভারত ভাগের সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানে বসবাসরত হিন্দুরা জেহাদি নির্যাতন অত্যাচার নিধনের শিকার হয়ে দলে দলে ভিটে-মাটি ছেড়ে রাতের অন্ধকারে সহায় সম্বলহীন হয়ে ভারতে আশ্রয় নিতে শুরু করলো। জমিদার তার জমিদারি ছেড়ে, ব্যবসায়ী তার ব্যবসা, কৃষক তার ফসল ভরা জমি, চাকুরে তার চাকুরি ত্যাগ করে ভারতে পলিয়ে এলো যা থেকে কংগ্রেস, কমিউনিস্ট, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, কায়েত, বৈশ্য, শূদ্র কেউ বাদ গেল না। পাকপ্রেমী হিন্দু কংগ্রেস-কমিউনিস্টরা রাজনীতি ভুলে ভারতে তথা পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিল। কিন্তু এই বিশ্বাসঘাতক কংগ্রেস কমিউনিস্টরা জেহাদি প্রীতি ভুলতে পারলো না। পাকিস্তান সৃষ্টির লক্ষ্যে সারা ভারত হিন্দুর রক্তে যে জেহাদিরা হোলি খেলে ভারতভূমি সিক্ত করেছিল তারা পরিকল্পিতভাবে ভারতভূমি ত্যাগ করে তাদের পাকিস্তানে গেল না। দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান সৃষ্টির দাবি সনদে তারা

জানিয়েছিল, কাফের হিন্দুদের সঙ্গে তারা একসঙ্গে বসবাস করতে পারবে না। তাই তারা ইসলামি শরিয়তি পবিত্রভূমি পাকিস্তান চাই। অথচ তারা ভারত ভাগের পর পাকিস্তান না গিয়ে হিন্দুভূমি ভারতে থেকে নতুন ষড়যন্ত্রের জেহাদি জাল বিস্তার করতে শুরু করলো। তাদের এই মিশনে কংগ্রেস-কমিউনিস্টরা আবার দোসর হলো। বিশ্বাসঘাতক বাম-কংগ্রেসিরা সুকৌশলে শিক্ষা ব্যবস্থায় ও প্রচারমাধ্যমে ভারতের গৌরবময় ইতিহাস, দর্শন, সংস্কৃতির পাঠক্রমকে বিকৃতি করে ছাত্র যুবদের মননে ও চিন্তনে সনাতন বিরোধিতা প্রবিষ্ট করলো। তাদের কোমল হৃদয়ে ভারতমাতার সুসন্তানরা স্থান পেল না, বিদেশি প্রভুরা লালিত হলো। ফলে স্বাধীনকামী প্রতিবাদী যুবসমাজ বাম-কংগ্রেস জোটের মিশনের ধর্মনিরপেক্ষতা ও সম্প্রীতির আঙ্গিকে আসক্ত হয়ে পড়লো। ফলে প্রতিবাদহীন রাজনৈতিক পরিবেশে বাম-কংগ্রেস দোষর ভারতে বসবাসরত পাকিস্তান পন্থীদের ভারতীয় নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি দিল। বাম-কংগ্রেসের এই কর্মকাণ্ড দেখে অবাক হতে হয় যারা ভারত ভেঙে পাকিস্তান তৈরি করলো তারা ভারতীয় নাগরিক সেজে অধিকার ভোগ করছে। আর যারা ভারতের স্বাধীনতার জন্য যুগ যুগ ধরে রক্ত ও প্রাণ বলিদান করলো তারা বা তাদের উত্তরসূরি নাগরিকত্ব হারিয়ে পাকিস্তানি হলো। এটা কি বাঙ্গালি হিন্দুদের ওপর বাম-কংগ্রেস জোট চরম বিশ্বাসঘাতকতা নয় কি? এখন ভাববার সময় এসেছে বাঙ্গালি হিন্দুদের।

বাম-কংগ্রেসের তৃতীয় বিশ্বাসঘাতকতা :

পাকপন্থী জেহাদিদের গায়ে ধর্মনিরপেক্ষতার চাদর ও সম্প্রীতির মুখোশ পরিয়েই বাম-কংগ্রেস জোট ক্ষান্ত হয় নাই। ভারতভূমির রাজনীতির অঙ্গনে তাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলো এবং ভোটাধিকার প্রদান করে রাজনৈতিক শক্তি প্রদান করলো। মুখোশের আড়ালে জেহাদির সমগ্র ভারতবর্ষে ইসলামি শাসনে পরিণত করার মিশন সার্থক করতে সদা বিভিন্ন বেশে কাজ করে চলেছে। জেহাদি গোষ্ঠীর রাজনৈতিক শক্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাম-কংগ্রেস জোটের সঙ্গে দোসর হিসেবে যোগ দিয়েছে পরিবার স্বার্থান্বেষী বিভিন্ন প্রদেশের আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল সমূহ যার বদল স্বরূপ জেহাদিরা দারুল-ইসলামের স্বপ্ন পূরণের মিশন শক্তি সঞ্চয় করে চলেছে।

বাম-কংগ্রেসের চতুর্থ বিশ্বাসঘাতকতা :

বাম-কংগ্রেস জোট ও তাদের দোসর আঞ্চলিক দলগুলি শুধু জেহাদি গোষ্ঠীর রাজনৈতিক শক্তি বৃদ্ধি করেনি। ভারতীয় রাজনীতির আড়ালে বিভিন্ন রাজ্য এক বা একের অধিক জেহাদি মদতপুষ্ট মাফিয়া ও গুন্ডারাজ সৃষ্টি করেছে। যারা তাদের স্বার্থ পরিপন্থী ভারতের কোনো আইন বা নীতি প্রণয়নে গোষ্ঠীগতভাবে আল্লাহ আকবর ধ্বনি তুলে ৪৭ সালের মতো হিন্দুদের বিষয় সম্পত্তি এবং সরকারি সম্পত্তি ও সম্পদের ধ্বংস ও ক্ষতিসাধন করে এবং কখনও কখনও প্রাণহানি করে চরম পথ অবলম্বন করে। হিন্দুদের ধর্মাচারণে বাধার সৃষ্টি করে। তাদের রাজনৈতিক শক্তি বৃদ্ধির কারণে কাশ্মীর থেকে দু' লক্ষ হিন্দু পণ্ডিত স্বাধীন ভারতে ভিটে মাটি হারা হয়ে কাশ্মীর থেকে বিতাড়িত হয়েছে। এজের বিরুদ্ধে বাম-কংগ্রেস গোষ্ঠীর সরকার দেশ বিরোধী বা রাষ্ট্রবিরোধী হিসেবে কখনো আইন প্রয়োগ করেনি।

বাম-কংগ্রেসের পঞ্চম বিশ্বাসঘাতকতা :

বাম-কংগ্রেসের মতো রাজনৈতিক শক্তি পূর্ববঙ্গ থেকে বিতাড়িত বাঙ্গালি হিন্দুদের সঙ্গে চরম বেইমানি করেছে। তাদের পশ্চিমবঙ্গে তাদের পুনর্বাসন দেয়নি। উপরন্তু তাদের ভারতের অন্য রাজ্যের জঙ্গল, পাহাড়, মরুভূমি ও ধূসর ভূমিতে এমনকী কালাপানির দ্বীপ ভয়ংকর আন্দামান নিকোবর দ্বীপে নির্বাসন করেছে। মরিচ ঝাঁপির গণহত্যা তার নারকীয় উদাহরণ। এদিকে পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে জেহাদি তোষণের রাজনৈতিক কার্যকলাপ ও গোলাবারুদের আঁতুড়ঘরে পরিণত করেছে। জেলায় জেলায় পরিকল্পিতভাবে মাফিয়ারাজ সৃষ্টি করেছে। পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে জেলায় জেলায় সন্দেশখালির মতো ঘটনা ঘটে চলেছে। উলুবেড়িয়া, হাওড়া, শ্রীরামপুর, রিষড়া, মেটিয়াবুরুজ, রাজাবাজার, পার্কসার্কাস, বেলডাঙ্গা, রেজিনগর, ইসলামপুর, করণদীঘী, বসিরহাট, ডায়মন্ড হারবার, নন্দীগ্রাম, এইরূপ বহু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। এইসব ঘটনায় বাম-কংগ্রেস-তৃণমূল নীরব ভূমিকা পালন করে চলেছে। ভারতপ্রেমী হিন্দুদের কাছে এর চেয়ে চরম বিশ্বাসঘাতকতা আর কী হতে পারে।

ষষ্ঠ চরম অশনিসংকেতের বিশ্বাসঘাতকতা :

অবৈধ অনুপ্রবেশের সার্বিক সহযোগিতা যা সত্তরের দশক থেকে শুরু হয়েছে। ১৯৭১ সালের বাংলাদেশ সৃষ্টির পর প্রায় ৫০ লক্ষ উর্দুভাষী পাকিস্তানি এবং পাকপন্থী রাজাকার, আলবদর, মুসলিম লিগ ও জামাত সদস্যরা ভারতে অনুপ্রবেশ করেছে। তারপর বামফ্রন্ট সরকারের সময় পরিকল্পিতভাবে প্রতি বছর হাজার হাজার অনুপ্রবেশকারী করে মিথ্যা পরিচয়পত্র সংগ্রহ করে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে আস্তানা গড়ে তুলেছে অনেকে এই দেশে। মায়নমার থেকে বিতাড়িত মুসলমান রোহিঙ্গাদেরও এরা আশ্রয় দিয়ে ভারতের জনবিন্যাসের ভারসাম্য নষ্ট করেছে, যার জন্য পশ্চিমবঙ্গে সীমান্ত অঞ্চলগুলি হিন্দু শূন্য হয়ে পড়ছে। এই জেহাদি অনুপ্রবেশ পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতভূমির জন্য অশনিসংকেত বয়ে এনেছে।

সপ্তম বেদনাদায়ক বিশ্বাসঘাতকতা :

১৪০ কোটি ভারতের নয়নের মণি বীরসন্তান নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর অন্তর্ধান এবং ভারত কেশরী শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর হত্যা যা বাম-কংগ্রেস ভারতবাসী তথা বাঙ্গালিদের কাছে উন্মোচন করেনি। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতাজীর আপোশহীন লড়াই আর পাকিস্তানের আগ্রাসন থেকে পশ্চিমবঙ্গ ও কাশ্মীরকে রক্ষায় শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর আত্মবলিদানকে সমগ্র ভারতবাসীর মনন চিন্তন ও হৃদয় কমল থেকে মুছে ফেলার বাম-কংগ্রেসের ঘৃণ্য বেদনাদায়ক চক্রান্ত ও বিশ্বাসঘাতকতা বাঙ্গালি তথা ভারতবাসী কোনো ভুলবে না। □

ভারতীয় পণ্য বর্জনের আহ্বানকারী পিনাকী বাংলাদেশে এখন বর্জিত ব্লগার

সেন্টু রঞ্জন চক্রবর্তী

বাংলাদেশের একজন হঠাৎ বুদ্ধিজীবীর নাম পিনাকী ভট্টাচার্য। খবর নিয়ে জানা গেছে নব্য এই বুদ্ধি ব্যবসায়ীর জন্ম ১৯৬৭ সালে বগুড়ায়। বগুড়া জেলা স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক এবং সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব শ্যামল ভট্টাচার্যের বড়ো ছেলে তিনি। বর্তমানে প্যারিসে বসে ভারতের বিরুদ্ধে কাঠি চালাচালি করে চলেছেন। তিনি জনবর্জিত বিএনপি এবং জামাত শিবিরের এখন প্রধান পরামর্শদাতা। আসলে তিনি একজন ব্লগার। ভারতের বিরুদ্ধে কথা বললেই যারা খুশি চেপে রাখতে পারেন না তারাই তার ভক্ত। বর্তমান বাংলাদেশে 'ভারতীয় পণ্য বর্জন' আন্দোলনের ডুবুরি নেতা তিনি। এক সময় বাম রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন এই পিনাকী ভট্টাচার্য। বাংলাদেশের রাজনীতির ইতিহাস এবং অন্যান্য বিষয়ের উপর ১৮টি বই তিনি রচনা করে পণ্ডিতের খাতায় নাম লিখিয়েছেন। রোহিঙ্গাদের পক্ষে দালালি করে এবং বর্তমানে বিএনপি'র সঙ্গে থেকে ভারতের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করাই তার এখন একমাত্র কাজ।

ভারতের বিরোধিতা করেই জন্ম হয়েছিল বিএনপি নামক দলটির। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল মুসলমান মোল্লাবাদী ও উগ্রবাদী ব্যক্তিরা। সঙ্গে গয়েশ্বর রায়ের মতো কিছু হঠকারী লোক তাঁদের সঙ্গ দিয়ে দলটিকে একটা মাত্রায় নিয়ে যেতে দিবাস্বপ্ন দেখেছিল। এখন উদ্‌ভ্রান্তের মতো ভারতের বিরোধিতায় নেমেছে। ভারতের বিরোধিতা করতে গিয়ে বিএনপি জামাত আম এবং ছালা দুইটা-ই হারিয়েছে।

ভারতীয় পণ্য বর্জনের ডাক দিয়ে বিএনপি জনবিচ্ছিন্ন হয়ে উঠেছে। আপামর জনতা তাদের এই অবাস্তব ডাকে সাড়া না দেওয়ায় দলটির এখন লেজে গোবরে অবস্থা।

অদূরদর্শিতার পরিণাম এতো ভয়াবহ হবে তা কাণ্ডজ্ঞানহীন দল বিএনপি বুঝতে না পেরে রাজনীতিতে বালখিল্য হয়ে হয়েই থাকলো। অবশ্য দলটির এই রকম হঠকারী সিদ্ধান্ত নতুন নয়। ক্ষমতা দখলের জন্য তারা এহেন কাজে বেশ পাকা।

অবস্থা বুঝে ভারত বিরোধিতা ছেড়ে তারা এখন কঠোর অবস্থান থেকে সরতে চাইছে। কিন্তু দুষ্ট গোরুর থেকে শূন্য গোয়াল অনেক ভালো। ভারত সেটা ভালোভাবেই জানে। এখন বিএনপি ভারতের মন পাওয়ার জন্য বিভিন্ন কায়দাকানুনের পথ খুঁজতে শুরু করেছে। এই জনবিচ্ছিন্ন দলটি ভারতের বিশ্বাস অর্জন করতে বারবার ব্যর্থ হয়েছে। বিএনপির নেতা-কর্মীরা এখন হতাশায় ভুগছে। এখন উপায় না দেখে ক্ষোভ প্রশমিত করে আবারও রাজপথের আন্দোলনে ফিরতে চাইছে। কিন্তু জল তো গড়িয়ে গেছে অনেক দূর। সমাধান সূত্র তো শুধু দুরপনেরই নয়, অনেকটা অসম্ভবও বটে। তাই দফায় দফায় বৈঠক করছেন নেতারা। সঙ্গে জোটের সঙ্গেও চলছে আলাপচারিতা। কিন্তু ফল হবে অশ্বডিম্ব। তাদের গুরু আমেরিকা চুপ রয়েছে। নিরুপায় হয়ে অন্য দেশগুলোর সঙ্গেও কৌশলগত সম্পর্ক বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়ার কথা ভাবছে দলটি। অবশ্য কোনো প্রকার গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুও হাতে নেই তাঁদের। ভাবছিল ভারতীয় পণ্য বর্জনের ডাক দিয়ে সফল হবে। গোল পাকিয়ে ক্ষমতায় চলে আসবে। আসলে সেটা ছিল কতিপয় ব্যক্তিবিশেষের চিন্তা। সব ফসকে গেছে, চলার পথে এখন অনেক কাঁটা। নিজেদের মধ্যেও মারাত্মক ভাবে দলটির কাদা ছোড়াছুড়ি চলছে।

রাজনৈতিক আশ্রয়ে পিনাকীবাবু এখন নতুন কী ভাবছেন সেটাই এখন অনেকের কাছে প্রশ্ন। কিন্তু তার শঠতা উন্মুক্ত হয়ে গেছে তার অনুসারীদের মধ্যে। বিএনপিকে ডুবানোর পিছনে পিনাকীর অবদান বিএনপি যেদিন বুঝতে পারবে সেদিন হয়তো একটু আলোর ছটা তারা দেখতে পাবে।

ভারতীয় পণ্য বর্জন কিংবা ভারত হটাও-এর মতো ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত যারা এখনো লালনপালন করে, তারা দেশটির মঙ্গল চাইছে না। ক্ষমতাসীন দল আওয়ামি লিগ এই সকল হঠকারিতার তীব্র প্রতিবাদ করেই ক্ষান্ত হয়নি। তারা বন্ধুপ্রতীম ভারতের হাত আরও শক্ত করে ধরেছে। বাংলাদেশের বর্তমান অগ্রযাত্রা লক্ষণীয়। যোগাযোগ ব্যবস্থাপনা-সহ সকল ক্ষেত্রেই সরকার নানা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে চলেছে।

লক্ষণীয় এই যে, বর্তমানে বাংলাদেশে ভারতের পণ্য আমদানি আরও বেড়েছে বলে একটি নির্ভরশীল সূত্র নিশ্চিত করেছে। অবস্থাটা এমন যে হঠকারী নেতাদেরই সে দেশের আপামর জনতা বর্জন ও বিসর্জন দুইটোই করতে শুরু করেছে।

পিনাকীবাবুদের মতো লোকেদের পৃথিবীতে অভাব নেই। প্রতিক্রিয়াশীল এসব লোকেরা কারও আপন হতে পারে না। তারা শুধুই জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে। তাদের দ্বারা পৃথিবীতে কল্যাণকর কোনো কাজ হয় না। ভারতীয় পণ্য নয় বরং পিনাকীবাবুদেরই বর্জন করা উচিত। এইটাই হবে সময়ের সঠিক করণীয়। □

ধ্যানস্থ প্রধানমন্ত্রী —তটস্থ বিরোধী পক্ষ

গত ৩০ মে শেষ হলো অন্তিম পর্বের ভোটের প্রচার। গত ১ জুন আটটি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ৫৭টি আসনে হয় শেষ দফার ভোটগ্রহণ। গত ৩০ মে সন্ধ্যে থেকে ১ জুন সন্ধ্যে পর্যন্ত দু'দিন তামিলনাড়ুর কন্যাকুমারীতে ভারতের শেষ প্রান্তের শিলাখণ্ডে বিবেকানন্দ শিলা মন্দিরের ধ্যানমণ্ডপমে ধ্যানস্থ ছিলেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর আধ্যাত্মিক জীবন দীর্ঘ। তরুণ বয়সে তাঁর গুরু ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ। মোদীজীর সাধনা তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত বিষয় হলেও, সেই সাধনার কিছু উদাহরণ, কিছু প্রতিফলন তাঁর জীবনচর্যাতেও পাওয়া যায়। ২০১৪ সালে নির্বাচনের প্রাক্কালে নরেন্দ্র মোদী মহারাষ্ট্রের রায়গড় দুর্গে গিয়েছিলেন এবং শিবাজী মহারাজকে স্মরণ করেছিলেন। ২০১৯ সালে লোকসভা ভোটের প্রচার শেষে গিয়েছিলেন কেদারনাথ। তাঁর জীবনের এই আধ্যাত্মিক সফরকে অব্যাহত রেখে এবার তিনি গেলেন দক্ষিণ ভারতে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মূল ভূখণ্ডের অদূরে এই শিলার উপর বসে ধ্যানস্থ হয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। পরিব্রাজক স্বামীজী ভারত ভ্রমণ করে এসেছিলেন তামিলনাড়ুর কন্যাকুমারীতে। সেই স্থান বঙ্গোপসাগর, ভারত মহাসাগর ও আরব সাগরের সঙ্গম স্থল। এই স্থানেই সন্ন্যাস জীবনের আলোকপ্রাপ্ত হয়েছিলেন স্বামীজী, লাভ করেছিলেন ঐশী নির্দেশ। পুরাণ কথা অনুযায়ী, এই স্থানেই শিবের জন্য তপস্যা করেছিলেন দেবী পার্বতী। ওই শিলার উপর দেবী পার্বতীর পদচিহ্ন রয়েছে। সাগর সঙ্গমে এই স্থানে রয়েছে সুপ্রাচীন সতী পীঠ। দেবী এই স্থানে ভগবতী কুমারী আম্মান বা দেবী কন্যাকুমারী রূপে পূজিতা। সেই সাধনস্থলে স্বামীজীর সাধনার ১৩১ বছর পর একই স্থানে ধ্যানস্থ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্বতন সরকার্যবাহ একনাথ রাণাডের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় বিবেকানন্দ কেন্দ্র, ১৯৭০ সালে এই ভূখণ্ডে স্থাপিত হয় বিবেকানন্দ রক মেমোরিয়াল। সেই স্থানে মোদীজী ধ্যানমগ্ন থাকাকালীন তাঁর ধ্যানস্থ হওয়ার ছবি সংবাদমাধ্যমে সম্প্রচারিত হওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার দাবিতে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনে চিঠি লেখেন তামিলনাড়ু সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক— কে. বালকৃষ্ণন। অভিষেক মনু সিংভির নেতৃত্বে কংগ্রেসের একটি প্রতিনিধি দল নির্বাচন কমিশনে গিয়ে অভিযোগ জানায় যে মোদীজীর ধ্যানস্থ হওয়া নির্বাচন চলাকালীন আদর্শ আচরণবিধি ভঙ্গের শামিল। কংগ্রেসের মতে, ৩০ মে ভোটপ্রচার সমাপ্ত হলেও প্রধানমন্ত্রী মোদীজীর ধ্যানের সম্প্রচার পরোক্ষে হয়েছে বিজেপির রাজনৈতিক প্রচারের হাতিয়ার। তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ এই দলগুলি টুপি পরে নমাজে অংশগ্রহণ করলে তখন কোনো কলরব ওঠে না। কিন্তু একজন সনাতনী হিন্দু ভারতের কোনো স্থানে ধ্যানমগ্ন হলে এই টুকরে টুকরে ব্রিগেড হয়ে ওঠে সোচ্চার! বারুইপুরে একটি নির্বাচনী জনসভায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিতে বলেছেন ক্যামেরার সামনে ধ্যান বা পুজো কেউ করে? উনি ক্যামেরার সামনে বসে লোককে দেখাচ্ছেন যে তিনি ধ্যান করছেন, ইত্যাদি। মুখ্যমন্ত্রী ভুলে যান যে তাঁর বাড়িতে কালীপূজা হলে, টেলিভিশনের পর্দায় তারও লাইভ সম্প্রচার হয়ে থাকে। প্রধানমন্ত্রী তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনে কোথায় ধ্যানস্থ হবেন, তাঁর ছবি সম্প্রচার করে সংবাদমাধ্যম তাদের দায়িত্ব পালন করলে তা সঠিক না বেঠিক— এই অহেতুক বিতর্ক সামনে এনে, হিন্দু হিসেবে নরেন্দ্র মোদীর ব্যক্তিগত অধিকার নিয়ে প্রশ্ন তুলে, তাঁর ধ্যানস্থ হওয়ার বিষয়ে রাজনৈতিক সমালোচনা করার উদ্দেশ্যে ছদ্ম- নিরপেক্ষতার ধ্বজাধারী রাষ্ট্রবিরোধী শক্তির এই ছক শুধুমাত্র নিন্দনীয় নয়— ঘৃণ্য!

—অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়,
খড়দহ, উত্তর ২৪ পরগনা।

'অল আইজ্ অন রাফা'

তেল আভিভকে লক্ষ্য করে প্যালেস্তাইনি জঙ্গি সংগঠন হামাস বেশ কিছু রকেট ছুঁড়লে গত ২৬ মে দক্ষিণ গাজার রাফায় একটি শরণার্থী শিবিরে ইজরায়েলের তরফে পালটা এয়ার স্ট্রাইক হয়। এর ফলে ৪৫ জন নিহত এবং প্রায় ২০০ জন আহত হন। সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে এই প্রতি-আক্রমণে ২ জন শীর্ষস্থানীয় হামাস জঙ্গির মৃত্যু হয়েছে বলে ইজরায়েলের দাবি। এই ঘটনার পরেই ফেসবুক, এক্স-হ্যান্ডেল, ইনস্টাগ্রামে 'অল আইজ্ অন রাফা'— শীর্ষক একটি ট্রেন্ডিং শুরু হয়। বলিউড সেলিব্রিটিদের মধ্যে রীতিমতো ধুম পড়ে ইনস্টাগ্রাম বিপ্লবের! প্রিয়াঙ্কা চোপড়া, বরুণ ধাওয়ান, আলিয়া ভাট, সামান্থা প্রভু, তৃপ্তি দিমরি, রিচা চাড্ডা, সোনম কাপুর, ভারতীয় ক্রিকেট তারকা রোহিত শর্মার স্ত্রী রিতিকা সাজদে ছিলেন এদের মধ্যে অন্যতম। রাফার এই ঘটনার প্রেক্ষিতে ভাইরাল এই ছবিটি ৪ কোটি ৬০ লক্ষেরও বেশি ইনস্টাগ্রাম ইউজার শেয়ার করেছেন বলে খবর। প্রশ্ন হলো, কাশ্মীরে যখন হিন্দু পণ্ডিতদের গণহত্যা সংঘটিত হয়, তখন ইনস্টাগ্রামের মতো সামাজিক মাধ্যমে প্রতিবাদে সোচ্চার হয় না কেন এই তথাকথিত এলিট সমাজ? সন্দেশখালির মা-বোনেদের ওপর এতগুলো বছর ধরে অত্যাচারের ঘটনা সামনে আসার পরেও কীভাবে সামাজিক মাধ্যমে চাপা পড়ে থাকে? এত জঘন্য ঘটনা সামনে আসার পরেও 'অল আইজ্ অন সন্দেশখালি' জাতীয় কিছু ট্রেন্ডিং হয় না কেন? মরে যাওয়া বিবেক নিয়ে এই 'সিলেক্টিভ আউটরেজ' প্রদর্শন করা সেলেবদের কাছে সব চেয়ে সহজ কাজ হলো দুনিয়া জুড়ে এই খতরনাক বাম-ইসলামিক ইকোসিস্টেম দ্বারা ভাইরাল হওয়া ট্রেন্ডিং স্টোরিগুলিকে ইনস্টাগ্রামে শেয়ার করে সস্তা প্রচারের আলোয় ভেসে থাকা। 'নীরজা' ছবিতে নীরজা ভানোতের চরিত্রে অভিনয় করে জনপ্রিয়তা অর্জন করা সোনম কাপুর 'অল আইজ্ অন রাফা'-শীর্ষক স্টোরিটি শেয়ার করার আগে ভুলে যান যে ভারতীয় এয়ার হোস্টেস নীরজাকে হত্যা করেছিল প্যালেস্তাইনি সন্ত্রাসবাদীরাই। নীরজা চরিত্রে অভিনয় করা সোনম এই ভাইরাল স্টোরিটি শেয়ার করে পরোক্ষে অপমান করলেন ইতিহাসে স্থান পাওয়া বীরাঙ্গনা নীরজা

ফঃ ৩

ভানোতকে। স্বাভাবিকভাবেই নেটিজেনদের দ্বারা ব্যাপক ট্রোলিঙের শিকার হয়েছেন এই সেলেব্রিটিদের দল। জেহাদিদের দিকে সর্বদা পরোক্ষ সমর্থনের হাত বাড়িয়ে দেওয়া এই সিউডো-সেকুলার সেলেবদের ভণ্ডামির কোনো শেষ নেই!

—অবিনাশ ভট্টাচার্য,
কলকাতা-৭০০০০৬।

নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিন্দাজনক

ষষ্ঠ দফায় নির্বাচনকে ঘিরে ভোটবঙ্গ এখন রণ বঙ্গে পরিণত হয়েছে। নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা কেন্দ্রীয় বাহিনীর চোখে মুখে অসহায়তা ফুটে উঠেছে। তারা ভোটকেন্দ্রে ভোটদাতাদের নিরাপত্তা দিতে পারছে না। উলটে তারা মার খাচ্ছে। রাজ্য পুলিশ কাঠের পুতুল ছাড়া আর কিছু মনে হচ্ছে না। অসভ্য, দাঙ্গাবাজ, লুঙ্গি বাহিনীর তাণ্ডবলীলা দেখে মানুষ তাজ্জব হয়ে যাচ্ছে। সন্দেশখালি থেকে শুরু হয়ে ঘাটাল, গড়বেতা, কেশপুর— দুই মেদিনীপুর জুড়ে চলছে সেই তাণ্ডব লীলা। খুন, ধর্ষণ ও রক্তমাখা এই নির্বাচন সহ্যের সমস্ত সীমানা লঙ্ঘন করেছে। এমন রণং দেহি পরিবেশের মধ্যে কেউ কি ভোট দিতে পারে? ভোট দান মৌলিক অধিকার, কিন্তু সেই অধিকার সুনিশ্চিত করতে পারে না ভারতের নির্বাচন কমিশন। নির্বাচন কমিশনারের মাস মাহিনা আছে, কিন্তু ডিউটি আছে বলে মনে হয় না। তিনি ঠুঁটো জগন্নাথ ছাড়া কিছু নন। এমন নোংরা রাজনীতির সঙ্গে এই অপদার্থ কমিশনকেও বঙ্গোপসাগরে নিক্ষেপ করলে যদি এই ভয়াবহ সমস্যার কিছুটা সুরাহা হয়! নির্বাচন কমিশন তাদের সংবিধান-প্রদত্ত দায়িত্ব পালনে অক্ষম। গাড়ি ভাঙচুর-সহ ঘর-বাড়ি জ্বালানো, খুন-জখম সব হচ্ছে, কিন্তু তার শাস্তি কোথায়? তা রুখতে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা কোথায়? তার ক্ষতিপূরণ কোথায়? ভোটাররা নির্বিঘ্নে ভোট দিতে পারবে না এমন নির্বাচনের কী প্রয়োজন? ডিএম থেকে বিডিও, এসপি থেকে এসডিপিও— যাঁরা নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্বে আছেন, তাঁদের ভূমিকা অত্যন্ত নেতিবাচক, হতাশাজনক। মানুষ খুন হলেই-বা কী! প্রশাসন এখন মাস্তানদের হাতে। আমলারা নিজেদের পিঠ বাঁচাতে ব্যস্ত। ভোটের দিন ঝাড়গ্রামের বিজেপি প্রার্থী পর্যন্ত মার খাচ্ছেন। ঘাটালে বিজেপি প্রার্থী হিরণের গাড়ি আটকে পথে আগুন জ্বেলে লাঠি ঘোরানো টেলিভিশনের পর্দায় আমরা দেখেছি। বিরোধী ভোটারদের আটকাতে সমস্ত নোংরা পথ অবলম্বন করছে রাজ্যের শাসক দল। এই আমাদের গণতন্ত্র! সন্ত্রাস করে জিতে আইনসভায় বসে তারা আইন তৈরি করবেন, ভাষণ দেবেন— ভাবতেও লজ্জা লাগে। এই নির্বাচন এই রাজ্যের নেতা-নেত্রীদের মুখোশ খুলে দিয়েছে, প্রধানমন্ত্রী, এমনকী সাধুসন্তদের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর ব্যক্তিগত আক্রমণ এবং বেলাগাম ভাষা-সন্ত্রাস মাত্রাছাড়া হয়েছে। কিছু আর বাদ নেই! এই নির্বাচন গোটা পশ্চিমবঙ্গকে নরক গুলজার বানিয়ে দিয়েছে! সন্ত্রাস যদি নির্বাচনের অঙ্গ হয় তাহলে বিপুল টাকা ব্যয় করে নির্বাচনের কী দরকার?

—সুবল সরদার,
মগরাহাট, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

পর্বতমালার নাম আরাবল্লী

ভারতে সাতটি উল্লেখযোগ্য বড়ো পর্বতমালা আছে। তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে আরাবল্লী বা আরাবলি পর্বতমালা। উত্তর-পশ্চিম ভারতের আরাবল্লী সম্ভবত বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন পর্বতমালা। প্রাচীনকালে এই পর্বতমালার অনেক শৃঙ্গই সারা বছর তুষারে ঢাকা থাকত। পর্বতমালার দৈর্ঘ্য উত্তর-দক্ষিণ বরাবর প্রায় ৬৯২ কিলোমিটার। দিল্লি থেকে যাত্রা শুরু করে হরিয়ানা, রাজস্থান হয়ে এই পর্বতমালা গুজরাটে শেষ হয়েছে। বিখ্যাত মাউন্ট আবু আরাবল্লীর অংশ যা রাজস্থানে রয়েছে।

এবার আরাবল্লী নামের তাৎপর্য সন্ধান করা যাক। সংস্কৃত 'আরাবলি' শব্দের অর্থ, শিখর শ্রেণী বা পর্বতশৃঙ্গের শ্রেণী। আরাবল্লী সম্ভবত বিশ্বের প্রাচীনতম ভঙ্গিল পর্বত। এটি বর্তমানে একটি ক্ষয়িষ্ণু পর্বতমালা। গঠনের শুরুতে আরাবল্লী ছিল 'ফোল্ডেড মাউন্টেন', ভাঁজ পর্বত বা কুঞ্চিত পর্বতমালা। কুঞ্চিত হওয়ার অর্থ পর্বতশ্রেণীর নানা স্থানে ঘন ঘন কোণ বা পর্বতশৃঙ্গ সৃষ্টি হওয়া। ঘন ঘন পর্বতশৃঙ্গ সৃষ্টি হওয়ার অর্থ শৃঙ্গের শ্রেণী বা 'রো অফ পিকস্'-এর সৃষ্টি হওয়া। সুতরাং, আরাবল্লী নামের তাৎপর্য হচ্ছে— পর্বতশৃঙ্গ শ্রেণী বা রো অফ পিকসের বাহুল্য।

—রাজকুমার জাজোদিয়া,
কালিয়াগঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর।

ভবিতব্য

এবার লোকসভা ভোটের শেষ দফার দিন বরানগর উপনির্বাচনে একটি দৃশ্যের সাক্ষী থাকল পশ্চিমবঙ্গের মানুষ-- সিপিআইএম-এর তন্ময় ভট্টচার্যের সঙ্গে স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলর শান্তনু মজুমদারের হাতাহাতি। তন্ময়বাবু নিজে বারনগর বিধানসভার প্রার্থী। তিনি একটি ভোটকেন্দ্রে গেলে তৃণমূল কাউন্সিলর রে রে করে তেড়ে আসেন তাঁর দিকে। অভিযোগ করেন, তন্ময়বাবু ভোটারদের প্রভাবিত করছিলেন। তন্ময়বাবুরও খুনি কমিউনিস্ট রক্ত জেগে ওঠে। একটু কথা কাটাকাটির পর তিনিও ঘুসি চালিয়ে দেন। নিমেষে মারামারি শুরু হয়ে যায়। এই দৃশ্য তো পশ্চিমবঙ্গে মানুষ দীর্ঘ চৌত্রিশ বছর দেখেছে। তখন তন্ময়বাবুরা কোনো বিরোধী নেতা-কর্মীকে কোনো বুথের ধারে-কাছে ঘেঁসতে দিতেন না। মনোনয়নপত্র জমা দিতে বাধা দেওয়া, বিরোধীদের প্রাণে মেরে ফেলা, রিগিং, ছাপ্পাভোট ইত্যাদি যতপ্রকার সন্ত্রাস তারা চালিয়েছেন। তন্ময়বাবুরা যে সন্ত্রাসের রাজনীতি শুরু করেছিলেন, সেটাই সহস্র গুণ বর্ধিত আকারে তৃণমূল দল গত বারো বছর ধরে প্রয়োগ করে চলেছে। তন্ময়বাবুদের তো আনন্দ হওয়ার কথা, তাদের সেরা ছাত্রী তাদেরই শেখানো বিদ্যা কত নিপুণভাবে প্রয়োগ করে চলেছে। তন্ময়বাবুদের এটাই ভবিতব্য। তাদের পশ্চিমবঙ্গের মানুষ যেমন ক্ষমা করেনি, এই তৃণমূলকেও করবে না।

—সুকোমল ভট্টাচার্য,
বরানগর, কলকাতা-৩৬।

রঙিন পানীয় ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়ায়

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

আমাদের চারপাশে যেসব মারণব্যাধি রয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে উপরের সারিতে রয়েছে ক্যানসার। কেননা যতবারই একে ওষুধ দিয়ে কাবু করার চেষ্টা করা হোক না, ততবারই ফিরে আসে এই মারণব্যাধিটি। আর এর চিকিৎসা যেমন ব্যয়বহুল, তেমনি কষ্টসাধ্য। রোগটিকে কোনওরকমে নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হলেও এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াতেও রোগী কাবু হয়ে যায়। কীভাবে এর থেকে মানুষকে বাঁচিয়ে রাখা যাবে তা চিকিৎসকদের কাছে একটা বড়ো চ্যালেঞ্জ। তবে ক্যানসারের কয়েকটি ক্ষেত্রে আমাদের চারপাশের এমন কিছু কারণ থাকে, যেখান থেকে হতে পারে রোগটি। ফলে সেগুলি সম্পর্কে সচেতন হলেই রোগের ঝুঁকি অনেকটাই এড়ানো সম্ভব।

আমরা জানি, ক্যানসার আটকাতে স্বাস্থ্যসম্মত, অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট পরিপূর্ণ ডায়েটের একটা ভূমিকা আছে। কিন্তু এমন কিছু বেভারেজ বা পানীয় আছে যা থেকে হতে পারে ক্যানসার। অবাক হওয়ার কথা,বেশ কয়েক ধরনের জল থেকেও ক্যানসার হতে পারে। শুনতে আশ্চর্য লাগলেও এটাই সত্যি।

একঝলক দেখে নেওয়া যাক কোন কোন পানীয় থেকে ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়ে :

১. **টিউবওয়েলের জল :** গ্রামাঞ্চলে টিউবওয়েলগুলো বেশিরভাগ মান্ধাতার আমলের। তার সংস্কার বা পরিচ্ছন্নতা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বজায় রাখা হয় না। আর যেসব পদ্ধতিতে টিউবওয়েল পরিষ্কার করা হয় তাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেওয়া হয় এমন কিছু রাসায়নিক যার

মধ্যে টক্সিন আছে। যেমন ক্লোরিন, এতে টিউবওয়েল পরিষ্কার হলেও মানব শরীরের পক্ষে তা অত্যন্ত ক্ষতিকর। এছাড়াও দেওয়া হয় ডিবিপি, যা ক্লোরিনের থেকে ১০০০ গুণ বেশি টক্সিক। আর এইসব জল খেলেই শরীরে ক্যানসারের সম্ভাবনা বাড়ে। তাই এই সমস্যা থেকে বাঁচতে চিকিৎসকদের বিধান হলো টিউবওয়েলের জল ফুটিয়ে জীবাণুমুক্ত করে কুঁজোতে রেখে বা শহুরে পরিবেশে অ্যাকোয়াগার্ডের ব্যবহার করতে হবে। সরাসরি টিউবওয়েলের জলপানে বিরতি দিন।

২. **বোতলজাত জল :** এই জল সবচেয়ে নিরাপদ বলে সাধারণ মানুষের একটা ধারণা থাকলেও এটাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকর। যদিও বোতলটা সিল করা থাকে, তবুও তার থেকে হতে পারে সমস্যা। কেননা এতে যে মিউনিসিপ্যালিটির জল ভরা হচ্ছে তা কতটা পরিশুদ্ধ সেটা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়। পর্বতের বিশুদ্ধ জলের মতো উৎস এটা নয়। কিন্তু বোতলজাত জলের সবচেয়ে ক্ষতিকর জিনিসটি হলো ওই বোতলটিই। কেননা একবার ব্যবহারের পরে বোতলগুলি ফেলে দেওয়া উচিত, কারণ এগুলি পুনর্নবীকরণ যোগ্য নয়, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুরনো বোতল ব্যবহার হয়, আর তাতে যে জল রাখা হয় সেই জলটি যে বিষাক্ত হয়ে পড়ে, তা আমরা জানি না। বেশির ভাগ প্লাস্টিকের বোতল তৈরি করতে বিসফেনল জাতীয় পদার্থ ব্যবহার করা হয়। আর এখান থেকেই মানব শরীরে হরমোনের ভারসাম্যহীনতা প্রোস্টেট ও স্তন ক্যানসার-সহ মেটাবলিক ডিজ-অর্ডারের ঝুঁকি কয়েকগুণ বেড়ে যায়।

৩. **অ্যালকোহল :** অতিরিক্ত পরিমাণে অ্যালকোহল গ্রহণ যে শরীরের ক্ষতি ডেকে আনে এবং তা মানুষকে ক্যানসার পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারে তা আমরা সকলে জানি। অনেকগুলো গবেষণা থেকে দেখা গেছে অ্যালকোহল মাত্রাছাড়া পান করার ফলে খাদ্যনালী, অন্ত্র, লিভার, কোলন ও স্তন ক্যানসার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অনেকেই মনে করেন সপ্তাহে কয়েকদিন রেড ওয়াইন খাওয়া ভালো, কেননা এতে আছে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট, তবুও আমাদের মনে রাখতে হবে এর মধ্যে থাকে ইথানল, যার থেকে ক্যানসারের ঝুঁকি জোরালো হয়।

৪. **এনার্জি ড্রিংক :** কয়েকঘণ্টা পরিশ্রমের পরে এনার্জি ড্রিংক খেলে আপনার শরীর হয়তো অনেকক্ষণ চাঙ্গা থাকে, কিন্তু তা থেকে শরীরের ভিতরে বড়োসড়ো ক্ষতি হতে শুরু করে। এতে থাকা শর্করা ও ক্যাফেইন থেকে আপনার রক্তচাপ ও রক্তশর্করার পরিমাণ কয়েকগুণ বেড়ে যায়। যেসব ব্যক্তি অতিরিক্ত পরিমাণে এনার্জি ড্রিংক খান, তাঁরা মূলত মারা যান হার্টের সমস্যা ও খিঁচুনি সমস্যা থেকে। কেননা এটি শরীরের ভিতরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে এতটাই দুর্বল করে দেয়, যে ক্যানসার সহজেই থাবা বসাতে পারে। আর অতিরিক্ত শর্করাজাতীয় পানীয় শরীরে ক্যানসার কোষের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে।

৫. **নিয়মিত সোডা পান :** অনেকেই হজমের জন্য বা গা বমি ভাব হলে বা শরীরে একটু অস্বস্তি হলে সোডা পান করেন। ভাবেন সোডার অনেকগুলো উপকারী দিক আছে। অন্যান্য এনার্জি ড্রিংকের মতো সোডাতেও শর্করা, ক্যাফেইন ও ক্ষতিকর আর্টিফিশিয়াল উপাদান থাকে। এর মধ্যে একটি রাসায়নিক হলো ক্যারামেল। এর জন্যই কোলার রং খয়েরি হয়, এর মধ্যে কারসিনোজেনিক মানে ক্যানসার হওয়ার উপাদান মজুত থাকে।

৬. **খাবার সোডা :** প্রচলিত ধারণা আছে খাবার সোডাতে প্রকৃত শর্করা থাকে না, কিন্তু এতে শর্করার বিকল্প মানে সুক্রোজ, স্যাকারিন, অ্যাসাপারটেম থাকে। এগুলি শরীরের মেটাবলিক ক্রিয়াকে ব্যাহত করে, ফলে শরীরে বেশি বেশি করে ফ্যাট সঞ্চিত হতে থাকে। যেখান থেকে হার্টের সমস্যা ব্লাডার ক্যানসার, মূত্রাশয়ের ক্যানসার ধরে যেতে পারে।

৭. **অতিরিক্ত গরম পানীয় :** বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার দেওয়া একটি সতর্কবার্তা অনুসারে অতিরিক্ত গরম পানীয় যেমন চা, কফি বা অন্য কোনও হেলথ ড্রিংক হোক খাওয়া বন্ধ করতে হবে। কেননা এটিও ক্যানসারের কারণ। এর থেকে অচিরেই গলায় ক্যানসার হতে পারে।

৮. **কফি দিয়ে তৈরি বিভিন্ন রকমের ফ্যান্সি পানীয় :** কফিতে সাধারণভাবে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট থাকে এবং এর কিছু উপাদান ক্যানসারের বিপরীতে শরীরকে লড়তে সাহায্য করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কফিবেসড অনেক পানীয় ও বেভারেজে সাধারণ কফির তুলনায় অতিরিক্ত ক্রিম ও শর্করা থাকে। যেমন— জাভা কফি বানাতে এর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে মিষ্টি সিরাপ, চকোলেট, ক্যারামেল হুইপড ক্রিম দেওয়া হয়। আবার কুড়ি আউন্সের একটি চকোলেট মোকাতে থাকে হোল মিল্ক ও উপরে হুইপড ক্রিম, এর মধ্যে থাকে ৫৮০ ক্যালোরি ও ২৬ মিলিগ্রাম ফ্যাট। প্রতিদিন এই ধরনের কফি খেলে ডায়াবেটিস ও ওবেসিটি সহজেই ধরে যায়, যার ফলে ক্যানসার হতেও খুব বেশি দেরি হয় না।

৯. **ফলের রসের পানীয় :** ফলের রস খাওয়া এমনিতে স্বাস্থ্যসম্মত। কেননা এতে শরীরে বেশ কিছু প্রয়োজনীয় ভিটামিন ও মিনারেলস ঢোকে। তবে ফল বা সবজি গোটা খেলে যে ফাইবার থেকে উপকৃত হয় শরীর, ফলের রসে সেটা থাকে না। যখনই খোসা ছাড়িয়ে ফলের রস খাওয়া হচ্ছে, তখন এর থেকে বাদ দেওয়া হচ্ছে ফাইবার। এই ফাইবার পেট অনেকক্ষণ ধরে ভর্তি থাকার অনুভূতি দেয়। এটি খাবারকে ধীরে ধীরে ভাঙে, ফলে রক্তশর্করাও চট করে বাড়তে পারে না। অতিরিক্ত শর্করা দেওয়া ফলের রস খেলে তা থেকে রেক্টাম ও কোলনের ক্যানসার হওয়ার সম্ভাবনা তরান্বিত হয়।

১০. **অতিরিক্ত স্মুদি :** ফলের রসের থেকে পানীয় হিসাবে স্মুদি নিঃসন্দেহে একটি ভালো বিকল্প। কিন্তু বাইরে থেকে বোতলজাত স্মুদি কিনে আনবেন না। চেষ্টা করুন সমস্ত উপকরণ এনে স্মুদি ঘরেই তৈরি করতে। বাজারের বোতলজাত স্মুদিতে প্রচুর শর্করা জাতীয় উপাদান থাকে, যা অতিরিক্ত খেলে ক্যানসার-সহ শরীরের অন্যান্য ক্ষতি ডেকে আনে।

১১. **স্পোর্টস ড্রিংক :** এটা সরাসরি ক্যানসারের জন্য দায়ী না হলেও শরীরকে ক্যানসারের দিকে কয়েককদম ঠেলে দেয়। তবে বাজারজাত যে সকল স্পোর্টস ড্রিংক পাওয়া যায় তাতে অতিরিক্ত সুগার ও কার্বোহাইড্রেট থাকে। আর সারাদিন ধরে প্রচুর পরিশ্রম না করলে বিকেলের দিকে স্পোর্টস ড্রিংক শুধু শুধু খাওয়ার কোনও কারণ নেই। সুতরাং ক্যানসার কীভাবে আটকানো যাবে সেই বিষয়ে যখন ভাববেন তখন এই সকল তরল পানীয়গুলোর কথাও মাথায় রাখুন। তাহলেই ক্যানসারের ঝুঁকি অনেকটাই এড়ানো সম্ভব হবে। □

অরণ্যষষ্ঠী আজও সমান প্রাসঙ্গিক

কল্যাণ গৌতম

যে দিনটিকে আমরা জামাইষষ্ঠী, বাঁটাষষ্ঠী বা স্কন্দষষ্ঠী নামে জানি, তারই আরেক নাম অরণ্যষষ্ঠী। এটি একটি নারীব্রত। জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লা ষষ্ঠীতে পালিত হয় এই ব্রত। আরণ্যক জীবনাভিজ্ঞতার এক প্রাচীন স্মৃতি এর মধ্যে লুকিয়ে আছে। অরণ্যের সঙ্গে এই দিনটি যুক্ত, সম্ভবত অরণ্যকেন্দ্রিক সভ্যতার সঙ্গে মানুষের হারানো যোগসূত্র। তখন অরণ্য-মাতাই ছিলেন মানুষের বেঁচে থাকার উৎস ও রসদদার। মানুষ সে যুগে খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান-ভেষজের জন্য অরণ্যের উপর নির্ভরশীল ছিল। তাই বছরের একটি দিন বন-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতো।

আরণ্যক যুগে যেমন গহন অরণ্যে বাসা বেঁধে থাকতে হয়েছিল, অরণ্য থেকে বেরিয়ে এসে কৃষি সভ্যতার যুগেও কৃষি-বন (Agroforestry)-এর ধারণা গৃহীত হয়েছিল, অরণ্যের উপর নির্ভরশীলতা তাই লোকসমাজ চিরকাল করে এসেছে। যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অরণ্যষষ্ঠীর আঙ্গিক বদলে গেলেও যুগের নানান পরত সরিয়ে আমাদের মূল রূপটি খুঁজে নিতে হবে। তা হলো, অরণ্যের অপরিমেয় জৈববৈচিত্র আজও আমাদের পরম আশীর্বাদ; আমরা অরণ্য মায়ের কাছে চিরকৃতজ্ঞ। কৃষিমাতা নতুন করে প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু অরণ্যের দেবীকে লোকসমাজ কখনও ভুলে যায় না। আজও তাই অরণ্যের কাছেই রক্ষা পাবার আশায় বারে বারে সে ফিরে যায়। জনজাতি মানুষকে বন থেকে পৃথক করা যায় না। ফুলে-ফলে-পল্লবে অরণ্য ভরে থাকুক আমাদের নানান প্রয়োজনে, অরণ্যষষ্ঠী সেই কৃতজ্ঞতার উপাসনা, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের অমোচ্য-সংযোগের শাশ্বত ইতিহাস।

দেবী ষষ্ঠী সন্তানের চির মঙ্গলময়ী মাতা। যেমন আপন সন্তান, আপনার কন্যার স্বামীও তার সন্তান, এই বোধটি প্রকটিত হয় জামাইষষ্ঠী নামের মধ্যে দিয়ে। হিন্দু মাতা তার পুত্র-কন্যার সমগ্র পরিবারটিকে একসূত্রে গাঁথতে চান এই দিনে, জামাই-আদর তারই প্রেক্ষাপটে রচিত। গ্রীষ্মের দিনে অধিকাংশ ভারতীয় ফল পেকে ওঠে শাখায় শাখায়। আম, জাম, জামরুল, কাঁঠাল, কলা, বুনো খেজুর, ফলসা, আঁশফল, কুসুম, গাব, কেন্দু, কামরাঙ্গা পেকে ওঠে নানান রঙে, নানান স্বাদে-গন্ধে। সুখের দিনে মা ছেলে-মেয়ের ভরা সংসার দেখতে চান, নাতি-নাতনীর হই-হুল্লোড় শুনতে চান, গাছে গাছে দাপাদাপি স্বচক্ষে দেখতে চান। তারপর যে অনেকদিন দেখা হবে না; শুরু হবে বর্ষা, নদীনালা জলে পূর্ণ হয়ে যাবে, যাতায়াত সুখের হবে না। তাছাড়া আমন চাষে ব্যস্ত হয়ে পড়বে সবাই। তাই ফলের মরসুমে সপরিবারে নিমন্ত্রণ। আবাস সন্নিহিত বাগিচায় অঢেল ফল পেকেছে, রকমারি পাখির আনাগোনা, হনুমান-কাঠবিড়ালি-খটাস পেটপুরে ফল পেয়েছে। এমনই এক ষষ্ঠীর দিনে দল বেঁধে কৃষি জমির উপান্তে জঙ্গল ঘেরা বাগিচায় প্রাচীন বৃক্ষের তলে অরণ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর মৃৎমঞ্চে সমবেত হয়েছে জনে-ধনেপূর্ণ পূজারিণীর দল।

ব্রতচারিণী হিন্দু রমণী এদিন তালপাতার পাখা বা ব্যজন সঙ্গে করে এনেছেন। আগেকার দিনে মায়েরাই তৈরি করে নিতেন এই পাখা, সংবৎসর ব্যবহার করবেন। দেবীপূজার আরও উপকরণ সঙ্গে নিয়ে মায়ের বনের মঞ্চে প্রবেশ। বৃক্ষতলে

অধিষ্ঠিত বিন্ধ্যবাসিনী অরণ্যষষ্ঠী। দেবীকে আন্তরিক ভক্তিশ্রদ্ধায় পূজা করেন মায়েরা, সমবেতভাবে দেবীর উপাখ্যান শোনেন, তারপর বিবিধ মরসুমি ফলমূল পরিবার ও আত্মীয়স্বজনকে বিতরণ করেন, পরিশেষে নিজেরাও তা গ্রহণ করেন। সন্তানসন্ততির পরম কল্যাণ কামনাই ব্রত্যের মূলকথা। বৃহত্তর অর্থে মনুষ্য সমাজ সবাই যে অরণ্যের সন্তান। দেবী অরণ্য, তুমি যাবতীয় সম্পদে ভরিয়ে দিও, আমাদের ঐশ্বর্যশালী করে তোলো। অরণ্য আহরিত পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ করে আমরা পরিপুষ্ট হবো। আমরা সুসন্তান লাভ করবো। অরণ্যকে দোহন করে দীর্ঘায়ু হবো, ধনেজনে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে জনপদ।

অরণ্যষষ্ঠী অরণ্যের উপান্তে গড়ে ওঠা এক যুগবাহিত জীবনবোধ। জানপদিক-সংস্কৃতির এক অমূল্য সাধনা। শেষে অরণ্যেই ছড়িয়ে পড়বে ফলের বীজ, তারপরেই আসবে বর্ষা, বীজের সুপ্তি কেটে চারাগাছ বেড়ে উঠবে, অরণ্যের প্রভূত বিস্তার হবে। অরণ্যের মাঝে ফলাহারের এ এক দারুণ উৎসব, অরণ্যকেই বর্ধিষ্ণু করে তোলার উৎসব। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক' উপন্যাসের জঙ্গলবন্ধু যুগলপ্রসাদ জঙ্গলের মধ্যেই সে বনস্পতির চারা লাগান, জঙ্গলেই বনসৃজন করেন। এ যে তেলা মাথায় তেল দেওয়া নয়! জঙ্গল কেটে ক্রমাগত বসতি স্থাপন করে, চাষাবাদ করে আমরা বনের রুখাশুখা মাটিকে নগ্ন করে দিই। বাদাবন কেটে ঝড়-ঝঞ্ঝার অবারিত দ্বার খুলে দিই। অরণ্য কেবল কাটার জিনিস নয়, লুঠ পাটের খেত নয়, তা ভারতীয় জীবনবোধ— চিরকালই দেখিয়ে এসেছে ভারতীয় হিন্দু, কলোনিয়াল লুঠেরাশক্তি ভারতবাসীকে অরণ্য লুঠপাট করতে শিখিয়েছে। কিন্তু প্রাচীন সাহিত্য শিখিয়েছে অরণ্য হচ্ছে 'দেবতার কাব্য'।

দেবী ষষ্ঠীর রূপকল্পনা কেমন? দেবী মানবীর মতোই দ্বিভুজা, দেবীর বাম কোলে রয়েছে একটি শিশু, তার বাহন একটি কালো বেড়াল। বাহন কল্পনার মধ্যে ফার্টিলিটি-কাল্ট বা প্রজনন- সংস্কৃতিকে মান্যতা দিয়েছে হিন্দু সংস্কৃতি। বেড়ালের বংশবিস্তার সম্পর্কে প্রাচীন মানুষ সচেতন ছিল। এই দিন বেড়ালকে ভালো-মন্দ খেতে দেবার মধ্যেও জীবসেবার আদর্শকে ব্রতের আঙ্গিকে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এখন একে শাস্ত্রীয় ব্রত বলা হলেও তার মধ্যে লৌকিক ধারাটি চমৎকার ভাবে রয়ে গেছে। এটি নারীব্রত; বিবাহিত নারী এই ব্রত পালন করেন। তবে কুমারী মেয়ে মায়ের সঙ্গে গিয়ে বিয়ের আগে থেকেই পরিচিত হয়। অরণ্যষষ্ঠী শাস্ত্রীয় ও অশাস্ত্রীয় উভয় অনুষ্ঠানের যুগলমূর্তি, দুইই মিশে আছে পাশাপাশি। শাস্ত্রীয় বলা হচ্ছে এই কারণেই— এই ব্রতের আঙ্গিকে বৈদিক অনুষ্ঠানের গভীরতা ও সজীবতা আছে; আছে আচমন, স্বস্তিবাচন, 'সূর্যঃ সোমো' মন্ত্রপাঠ, কর্মারম্ভ সংকল্প, ঘটস্থাপন, আসনশুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি, মাতৃকান্যাস, বিশেষার্ঘ্য স্থাপন, গণেশ ইত্যাদি দেবতার পূজা; আছে অঙ্গন্যাস, করন্যাস, ষষ্ঠীর ধ্যান; দেবীর পূজা এবং পূজান্তে ব্রাহ্মণকে দান-দক্ষিণা।

অরণ্যষষ্ঠীর ব্রতকথার মূল বিষয় হলো মা এবং পরিবার- কেন্দ্রিকতা যে মানুষের কাছে স্বর্গসুখের চাইতেও বেশি, তার প্রকাশ। জননীকে সংযমশীলা, নির্লোভা, ভক্তিররায়ণা করে তুলতে সহায়তা করে এই ব্রত। মায়ের যাবতীয় মানবিক গুণ প্রকাশিত হয়। মা তার সন্তানকে প্রকৃতিপ্রেম শেখান।

ব্রতকথায় রয়েছে এক গৃহস্থ রমণী লোভের বশবর্তী হয়ে নিত্যদিন ভাঁড়ারের নানান খাদ্যবস্তু চুরি করে খায়, প্রশ্ন উঠলে বিড়ালের নামে অপবাদ দেয় এবং এইভাবেই আত্মরক্ষা করে। এদিকে বিড়াল দেবী ষষ্ঠীর বাহন। তাই দেবীর কোপে পড়ে সেই রমণী। একাদিক্রমে ছয় পুত্র জন্মানোর অব্যবহিত পরেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তার ছয় পুত্র প্রকৃতপক্ষে শাপভ্রষ্ট বিদ্যাধর। ক্রমান্বয়ে মৃত্যুর ঘটনায় শ্বশুরবাড়িতে এবং সমাজে রমণীর প্রবল বদনাম হয়। তারা তাকে সন্তানভোজী রাক্ষসী ঠাওর করে। ধরে নেয়, নিজের সন্তান নিজেই খেয়ে ফেলে বধূটি! আত্মগ্লানিতে রমণী গৃহ পরিত্যাগ করে বনে চলে যায়।

বনে অজান্তেই দেবীর থানে এক বৃক্ষতলে আশ্রয় নেয় সে। গৃহে তার শাশুড়ি-মা ষষ্ঠীর আরাধনায় রত হন। বনে জন্ম নেয় বধূর সপ্তম সন্তান। জন্মাতেই আগের বিদ্যাধর ভ্রাতারা নবজাককে এসে ডাক দেয়, শিশুটিকে স্বর্গের যাবতীয় সুখের হাতছানি দিয়ে ডাকে। নবজাতক তার মা-কে জড়িয়ে ধরে বলে, মা কিংবা বোনকে ছেড়ে তার যাওয়া হবে না, যতই স্বর্গের ভোগ ও সুখ তাকে ডাক দিক না কেন! নবজাতক সেই ডাকে সাড়া দেয় না।

মায়ের ঘুম ভাঙিয়ে ডাকে সপ্তম সন্তান। সন্তানকে কোলে জড়িয়ে মা কেঁদে ওঠে; দেবী ষষ্ঠীকে একমনে ডাকতে থাকে। মা দেবীর থানেই তখন আশ্রিতা, দেবী সহসা আবির্ভূতা হন; বলেন, বিড়ালের নামে অপবাদ দেওয়ার অপরাধে তিনি তার সকল সন্তানকে লুকিয়ে রেখেছেন, তার প্রতিটি সন্তানই দেবতুল্য। মা দেবীর চরণ-প্রার্থনা করলে, দেবী এক মরা পচা বিড়ালের উপর দই ফেলে জিভ দিয়ে চেটে তা তুলে আনতে নির্দেশ দেন মা-কে। মা সেই নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে দেবীর কৃপায় বিড়াল-সহ হারানো ছয় পুত্র ফিরে পায়। সবাহন ষষ্ঠীদেবীকে পূজা করে মা; সপুত্র গৃহে ফিরে আসে, পরিবারে খুশির ঢল নামে। ■

ফল পরিচিতি : বুদ্ধ নারকেল

সম্বিত চৌধুরী

একটি আশ্চর্যজনক ফলের সঙ্গে পরিচয় করা যাক, যাকে বুদ্ধ নারকেল বা টেরিগোটা অ্যালাটা বলা হয়। এটি মালভেসি পরিবারের অন্তর্গত। উইলিয়াম রক্সবার্গ এই উদ্ভিদটিকে ১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দে প্রথম খুঁজে পেয়েছিলেন। এটি পূর্ব ভারতের একটি স্থানীয় প্রজাতির উদ্ভিদ। এর ফলের বীজ বাদাম হিসেবে খাওয়া হয়, গাছের উচ্চতা প্রায় ৪০ মিটার। এই উদ্ভিদটির দুটি আকর্ষণীয় দিক রয়েছে। একটি হলো এই ফলটির নামকরণ 'বুদ্ধ নারকেল' কেন হলো এবং অন্যটি এই উদ্ভিদটির বিকৃতি জাত যাকে আমরা 'ম্যাড ট্রি' বা 'পাগলা গাছ' বলি।

যখন আমি প্রথম 'বুদ্ধ নারকেল' নামটি শুনি তখনই আমার মনে একটি প্রশ্ন জাগে যে গৌতমবুদ্ধ এই গাছের সঙ্গে কীভাবে সম্পর্কিত! আমি ভেবেছিলাম হয়তো গৌতম বুদ্ধ কখনও এই বাদাম খেয়েছিলেন বা এই গাছের নীচে বসে ধ্যান করেছিলেন, তাই এটির নাম হয়েছে। তবে আসল ঘটনাটি অনেকটাই অন্যরকম। যেহেতু এই গাছের বীজের শুঁটিটি গোলাকার এবং বীজ পরিপক্ক হলে সেটি ফাঁপা হয়ে যায়, তাই প্রাচীনকালে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা এটিকে পাত্র হিসেবে ব্যবহার করতেন। ছবিটি দেখে কল্পনা করা যেতে পারে যে এই পাত্রটি কেমন দেখতে হতে পারে।

পরবর্তী আকর্ষণীয় দিকটি হলো এই গাছটির বিকৃত রূপ যাকে আমরা 'ম্যাড ট্রি' বা পাগলা গাছ বলি। এখন একটি প্রশ্ন জাগে, কীভাবে এই গাছটি পাগলের শিরোনাম পেতে পারে। আসল ঘটনাটি হলো পাতাগুলির আকার ও পরিমাপ একটির থেকে আরেকটি সম্পূর্ণ আলাদা।

কিন্তু মনে রাখতে হবে, সব টেরিগোটা অ্যালাটা (*Pterygota alata*) পাগলা গাছ নয়। হাজারের মধ্যে একটি গাছ এই অনিয়মিত চরিত্রটি পায়। বিজ্ঞানীরা এই বিকৃত জাতটিকে *Pterygota alata* var irregularies নামকরণ করেছেন।

এই উদ্ভট ঘটনার পিছনের প্রকৃত কারণ এখনও বিজ্ঞানের কাছে অজানা। এই উদ্ভিদটিকে আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু ইন্ডিয়ান বোটানিক গার্ডেন, বালিগঞ্জ সায়েন্স কলেজ, আলিপুর চিড়িয়াখানা এবং আরও অনেক জায়গায় দেখতে পাওয়া যায়।

এই গাছের বীজের স্বাদ প্রায় চিনাবাদামের মতোই সুস্বাদু কিন্তু ফ্যাটের শতাংশ কম।

আম এবার টানাটানি

বাজার ছেয়েছে 'চীনা ফল'

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী

এ বছর আমের মুকুল আসার পূর্বাপর কয়েক মাস আবহাওয়া জনিত প্রতিকূলতা ছিলই, তার উপর সাম্প্রতিক ঘূর্ণিঝড় 'রেমাল'-এর প্রভাব। এসব কারণে দক্ষিণবঙ্গের বাজারে আম মাহাঙ্গা। ফলহারিণী কালীপূজা এবং জামাইষষ্ঠীর মরসুমেও বাজারে আমের আমদানি মোটেই নজর কাড়ে নি। জলদি জাত বোম্বাই, হিমসাগরের ফলন দক্ষিণবঙ্গে অত্যন্ত কম। মালদাতেও এবার আমের ফলন আশাপ্রদ নয়। কিন্তু এ বছর লিচুর ফলন বিগত কয়েক বছরের মধ্যে সেরা, বিশেষত মুজফফরপুর ও বোম্বাই জাতের লিচুর ফলন। চাষির আয়ও তাই ভালো। লিচুচাষির মুখে হাসি। যদিও অনেকে 'রেমাল'-এর কারণে আগে লিচু পেড়ে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন, পাছে অপচয় হয়!

লিচুর আদি নিবাস হচ্ছে চীন। তাই অনেকে একে 'চায়না প্রোডাক্ট' বলে থাকেন। কিন্তু যে গাছ আড়াইশো বছর ধরে এদেশের মাটি, জলহাওয়ার সঙ্গে বিশেষভাবে মানিয়ে নিয়েছে, মানুষের সঙ্গে পরিবেশগত সখ্য জন্মিয়ে দিব্যি থিতু হয়েছে, তাকে আমরা বিদেশি ফল বলতে পারি না। বছর দশেক আগে একটি রেডিয়ো সাক্ষাৎকারে কলকাতা স্টুডিয়োতে উপস্থিত ছিলাম। আলোচনার মধ্যে জনৈক পীযূষ দেবের লেখা একটি ছড়া পাঠ করেছিলেন অনুষ্ঠানের সঞ্চালক। ছড়াটির মধ্যে ছিল লিচুচাষের সদর্থকতা, তার সঙ্গে চীনা প্রসঙ্গ— 'কপালেতে হাত?/চায়না প্রোডাক্ট,/দিও না ফেলে/চাষির ছেলে/রসালো স্বাদু/আছে কি জাদু!/লিচুর ফলে/কৃষি স্বচ্ছলে,/উন্নত জাত/বাড়াও হাত/থাকে যদি জমি,/লাগাও এখুনি/ফিরে দেব ধন/পাবে মন মন।' মনে আছে সেদিন পরাশর বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি ছড়া পড়া হয়েছিল, 'চীন থেকে এল লিচু/শাহি, দেশি, বেদানা,/কসবা, পূরবী নফর,/ দেরাদুন, চায়না।/মিষ্টি মধুর ফল/খাসা খেতে চায়না।/দাম যা তখন চড়া, /দাম দিয়ে পাই না।' এই ছড়ার মধ্যে ছিল লিচুর জাত বৈচিত্র্যের রকমফের, আর লিচুর উচ্চমূল্যের কথা।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকদের মাধ্যমে মায়ানমার হয়ে অসমের মধ্যে দিয়ে ভারতে এসে পৌঁছায় লিচু। লিচু চাষের জন্য আর্দ্র নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া প্রয়োজন হয় যা ভারতবর্ষে আছে। লিচু কিন্তু নির্দিষ্ট আবহাওয়াই পছন্দ করে। সেখানে যদি সঠিক আবহাওয়া না পায়, লিচুর ফলন ভালো হবে না, গাছ বাড়বে না, গাছ মরে যাবে। লিচু চাষ করতে হলে বরফ বা তুষারপাত মুক্ত অঞ্চল হওয়া চাই। গরম তাপপ্রবাহ বা লু-আবহাওয়া হলে সেখানে লিচুচাষ চলবে না। গরমকালে যে বাতাস বয়, তা আটকাতে লম্বাজাতের গাছ বা 'উইন্ডব্রেক' পাশে লাগাতে হবে। বার্ষিক বৃষ্টিপাত ১২০০-১৫০০ মিলিমিটার হওয়া দরকার। তার থেকে কম বৃষ্টিপাতেও লিচুচাষ হয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে

মাটিতে যাতে আর্দ্রতা যথাযথ সঞ্চিত থাকে তার জন্য কিছু গাছের পাতা, খড় ইত্যাদি দিয়ে মাটি ঢেকে দিতে হবে, যাতে বাষ্পীভবন না ঘটে। গড় মাসিক তাপমাত্রা হতে হবে ২০-৩০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। সেটা ভারতবর্ষের নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে আছে। শীতকালে আবহাওয়া শুষ্ক হওয়া দরকার। থাকতে হবে কাঁটা লাগা শীত।

লিচুর জন্য বেলে-দোঁয়াশ বা এঁটেল-দোঁয়াশ মাটি দরকার। নবীন পলিমাটি বিশেষ করে ফারাক্কা, কালিয়াচক অঞ্চলে যে নবগঠিত পলিমাটি সেখানে ভালো লিচুর চাষ হয়। মাটির পিএইচ ভ্যালু বা ক্ষারাম্ল মান ৫.৫ থেকে ৬.৫ হতে হবে। মাটির গভীরতা যথেষ্ট থাকতে হবে, তার কারণ গাছের শিকড় মাটির গভীরে ছড়িয়ে যায়। তাই যেখানে মাটির স্তর অল্প সেখানে লিচুগাছ লাগানো যায় না। জলস্তরের লেবেল দেড় থেকে দুই মিটার গভীরে থাকতে হয়। যেখানে লিচুগাছ লাগানো হয় সেখানে অন্য জায়গা থেকে লিচুগাছের গোড়ার কিছুটা মাটি সংগ্রহ করে এনে বিছিয়ে দিতে হবে। তার কারণ সেখানে থাকে লিচুর বাড়বাড়ন্তের জন্য উপযোগী মাইক্রোরাইজা জীবাণু।

আমরা অনেক ফসল দেখেছি যা আদি বাসভূমি থেকে বাইরে ছড়িয়েছে। নতুন পরিবেশে তার ফলনও বেড়েছে। পর্তুগিজরা লাতিন আমেরিকা থেকে যে সমস্ত ফসল ভারতবর্ষে এনেছিলেন তার মধ্যে লঙ্কা, কুমড়োও ছিল। এখন দেখা যাচ্ছে সেখানে যা উৎপাদন হতো তার থেকে বেশি উৎপাদন অন্যান্য জায়গায় হচ্ছে। লিচু ভারতবর্ষের আদি ফসল না হলেও তাকে বহিরাগত ফসল বলা চলে না। আর আদি/অন্ত এটার ব্যাপারে শেষ কথা বলবেই-বা কে!

লিচুচাষের সবচেয়ে অগ্রগণ্য রাজ্য হলো বিহার। বিহার ছাড়া উত্তরপ্রদেশ লিচুচাষের গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য। এছাড়া অসম, ওড়িশা, উত্তরাখণ্ড, পাঞ্জাব, ত্রিপুরা, অরুণাচল প্রদেশ লিচু উৎপাদক রাজ্য হিসেবে নজর কেড়েছে।

ভারতের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে লিচুর উৎপাদনশীলতা প্রতি হেক্টর প্রায় ১০ মেট্রিক টন। লিচুর চাষ লাভজনক বলেই নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদহের বহু চাষি লিচু চাষ করছেন। দক্ষিণ ২৪ পরগনার মধ্যে বারুইপুর মহকুমা যেখানে মাটিতে নোনাভাব কম, সেখানেও ভালো লিচু উৎপাদন হয়। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের জন্য

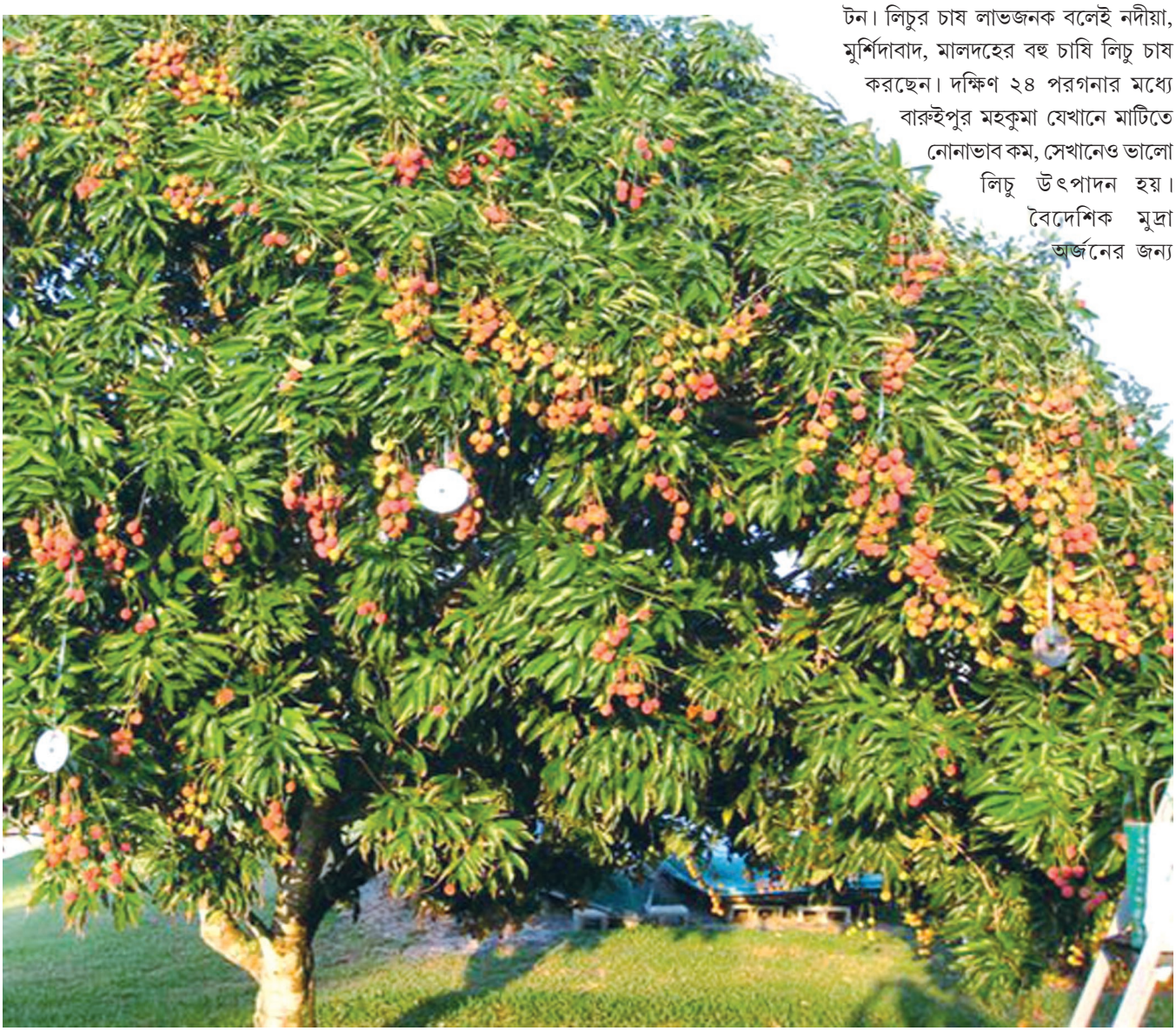

উন্নতমানের লিচু উৎপাদন করা প্রয়োজন।

বিশ্ববাজারে সমাদৃত হয় 'লিচি-নাট' বা শুকনো গোটা লিচু। পাশাপাশি সতেজ লিচু, লিচু পানীয়ের বিষয়েও খেয়াল রাখতে হবে। লিচি-নাট হলো এক ধরনের প্রক্রিয়াকৃত পদার্থ। লিচুর খোলাটা আছে, ভিতরে শাঁস আছে এবং ভিতরে বীজটাও আছে। কিন্তু সেটা একটা শুকনো ফলের মতো। চীন দেশে এটা খুব জনপ্রিয়। লিচুটিকে গোটা শুকিয়ে নেওয়া হয়। তারপর নাটটাকে দীর্ঘদিন সংরক্ষিত রাখতে হয় মাটির হাঁড়িতে বা অন্যত্র। এটাই হলো লিচু-নাট। লিচুকে অল্প ঘনত্বের হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডে সামান্য ধুয়ে নেওয়া হয়। তারপর সেটাকে ভালো করে জলে ধুয়ে কিছুটা গরম জলে আংশিক সেদ্ধ করে নিয়ে কোনোও একটি জায়গাতে সালফার ডাই অক্সাইডের ধোঁয়ায় জীবাণু মুক্ত করা হয়। তারপর সেটাকে রোদে শুকাতে দেওয়া হয়। এই ভাবে তার মধ্যে জলীয় পদার্থকে শুকিয়ে দীর্ঘদিন রাখা যায়। একেই বলে লিচু-নাট। সারা বিশ্বে বিশেষ করে চীন, জাপান, তাইওয়ান, থাইল্যান্ড ইত্যাদি জায়গায় জনপ্রিয়।

লিচুর উন্নত জাতের মধ্যে বোম্বাই, বেদানা, নফরপাল ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। পশ্চিমবঙ্গে যে জাত চাষ হয় তার মধ্যে বোম্বাই জাত বাণিজ্যিক দিক দিয়ে সবচেয়ে অগ্রগণ্য। বোম্বাই জাতটা জ্যৈষ্ঠ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে পাকে। তারপরে আসে চায়না। তবে গুণমানে যে জাতটা সবার নজর কেড়েছে সেটা হলো বেদনা। নাম থেকেই স্পষ্ট যে এতে আছে দানা তবে সেই বীজটা খুব ছোটো, শাঁসের পরিমাণই বেশি। দেশি জাতটি জ্যৈষ্ঠের শেষার্ধে পাকে, আবার অনেক সময় আষাঢ়ের প্রথমে একে পাওয়া যায়। এছাড়া মুজফফরপুর বিহারের শ্রেষ্ঠ বাণিজ্যিক জাত। এটা আবার দু' রকম— আর্লি ও লেট। পশ্চিমবঙ্গে কিছু আঞ্চলিক জাত পাওয়া যায়। যেমন বারুইপুর, কলকাতা (কলকুটিয়া), পূরবী। তবে বোম্বাই জাতের চাষ সবচেয়ে বেশি। তারপরই চায়না। এছাড়া এলাচি, গুলাবি জাতও পাওয়া যায়। এলাচিতে এলাচের গন্ধ আট গুলাবিতে গোলাপের গন্ধ।

লিচুকে গুটি কলম বা জোড় কলমের দ্বারা বংশবিস্তার করানো যায়। চারা রোপণের আদর্শ সময় হচ্ছে জুন-জুলাই এবং সেপ্টেম্বর মাস। ৮মি × ৮মি থেকে ১০ মি × ১০মি দূরত্বে চারা রোপণ করতে হবে। রোপণের দূরত্ব নির্ভর করে জাত, মাটি আর আবহাওয়ার উপর। চারা রোপণের সময় ৯০ সেমি × ৯০ সেমি × ৯০ সেমি মাপের গর্ত করতে হবে, গর্তে দিতে হবে ২০ কেজি গোবর বা কম্পোস্ট সার, ২ কেজি কাঠের ছাই, ৫০০ গ্রাম হাড়ের গুড়ো এবং এক ঝুড়ি পুরনো লিচু গাছের গোড়ার মাটি। গাছ প্রতি বছর প্রতি নাইট্রোজেন ফসফেট এবং পটাশ যথাক্রমে ১০০, ৫০ ও ১০০ গ্রাম করে দু'বারে সার দিতে হবে। সেচের ব্যবস্থা থাকলে ফল পাড়ার পর এবং গুটি ধরার পর সার দিতে হয়। সেচের ব্যবস্থা না থাকলে ফল পাড়ার পর পুরো নাইট্রোজেন ও অর্ধেক পরিমাণ ফসফেট ও পটাশ এবং বাকি অর্ধেক ফসফেট ও পটাশ সেপ্টেম্বর মাসে প্রয়োগ করতে হবে।

চারা গাছে গ্রীষ্মকালে সপ্তাহে দুদিন এবং শীতকালে ১০-১৫ দিন অন্তর সেচ দিতে হবে। ফল ধরলে ৭-১০ দিন অন্তর সেচ দেওয়া প্রয়োজন এবং ফল পাড়ার দিন ১০ আগে তা বন্ধ করতে হবে। গুটির বাড়-বৃদ্ধি করতে ও গুটি-ঝরা বন্ধ করতে ফলের আকার মটর দানা ও মার্বেল অবস্থা লাভ করলে এন এ এ ২০-৩০ মিলিগ্রাম অথবা জিব্বারেলিক অ্যাসিড ২৫-৫০ মিলিগ্রাম অথবা ২,৪-ডি ১০ মিলিগ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে। ফল ফাটা ও মরচে ধরার সমস্যা দেখা দিলে ফল ধরার পর ৭-১০ দিন অন্তর নিয়মিত ভাবে সেচ দিতে হবে। আর দিতে হবে অনুখাদ্য— জিঙ্ক সালফেট ১.০ শতাংশ, বোরন ০.৩ শতাংশ। এই অনুখাদ্য ফল ধরার ১৫ দিন পর থেকে ১৫ দিন অন্তর ২ বার প্রয়োগ করলে ফল ফাটা ও মরচে ধরা সমস্যা কম দেখা যায়।

লিচু চাষ করে কি চাষিরা লাভবান হতে পারবেন? এককথায় উত্তর হলো অবশ্যই পারবেন। কারণ লিচু চাষ আজ এক শিল্পের পর্যায়ে পৌঁছেছে, একটি ভৌমশিল্প যেন! এ রাজ্যে লিচুর উৎপাদনশীলতা হেক্টরে প্রায় ১০ মেট্রিকটন। ফলে এক বিঘাতে উৎপাদন প্রায় তেরশো কেজি। যদি বাগান থেকে চাষি কুড়ি টাকা কেজি দরেও ফল বিক্রি করতে পারেন (যদিও বাজারে দাম ৮০ থেকে ১০০ টাকা কিলো), তাহলে এক বিঘা জমি থেকে ফল বেচে চাষি পাবেন প্রায় আঠাশ/তিরিশ হাজার টাকা। চাষের খরচ বিঘাতে প্রায় আট হাজার টাকা বাদ দিলে চাষির নিট লাভ থাকবে বিঘায় কুড়ি/বাইশ হাজার টাকা। এর সঙ্গে যদি সাথী-ফসল হিসেবে বাগান তৈরির প্রথম দফায় কিছু সবজি ও পরে কিছু মশলা যেমন আদা-হলুদ লাগানো যায়, তবে বিঘাতে অতিরিক্ত পাঁচ হাজার টাকা লাভ হবে।

তবে মনে রাখতে হবে, গাছের বাড়বাড়ন্ত বেশি হলে ইচ্ছেমতো সবজি চাষ করা সম্ভব হয় না। তাহলেও দেখা যাচ্ছে এক বিঘা জমি থেকে সাথী-ফসল সমেত মোট আয় পঁচিশ হাজার টাকা। এটা প্রথাগত চাষ করে চাষি পেলেন। এবার তার সঙ্গে যদি নতুন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি যোগ করা যায়, তাহলে চাষের উৎপাদন কমপক্ষে পঁচিশ শতাংশ বাড়তে পারে, অবশ্য চাষের খরচও সামান্য বাড়বে। যদি এই পঁচিশ-ত্রিশ শতাংশ ফলন অধিক হয় তখন লাভের পরিমাণ দাঁড়াবে প্রায় একত্রিশ হাজার টাকা।

এই লাভের অঙ্কটা আসবে সাধারণ ভাবে ১০ × ১০ মিটার দূরত্বে লিচু গাছ লাগিয়ে। এবার তার সঙ্গে যদি ঘন চাষ করা হয় (High density Orchard), তবে লাভের পরিমাণ আরও বাড়ে। দ্বি-বেড়া সারি (Double Hedge Row System) করে লিচু লাগালে; প্রথাগত পদ্ধতিতে যেখানে বিঘাতে ১৩টি গাছ লাগানো সম্ভব হয়, দ্বি-বেড়া সারিতে বিঘাতে ২৯টি গাছ লাগানো যাবে, অর্থাৎ ২২২ শতাংশ বৃদ্ধি। দ্বি-বেড়া সারিতে দুটি বেড়ার মধ্যের দূরত্ব থাকবে ৫ মিটার এবং বেড়া-সারিগুলির মধ্যে গাছের দূরত্বও ৫ মিটার হবে। দুটো বেড়া সারির মাঝে স্বাভাবিক দূরত্ব হবে ১০ মিটার। তারপর আবারও দুটি বেড়া সারি দিতে হবে। এই পদ্ধতিতে লিচু লাগালে এক বিঘাতে ৫০-৬০ হাজার টাকা চাষি লাভ করতে সক্ষম হবে। ■

ধুপগুড়িতে মন্দির ভাঙচুরের প্রতিবাদে গাজোলে প্রতিবাদ সভা

জলপাইগুড়ি জেলার ধুপগুড়িতে বিধর্মীদের মন্দির ভাঙচুরের প্রতিবাদে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উদ্যোগে মালদা জেলার গাজোলে গত ২২ মে এক প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়। পথসভায় ভাষণ দেন কাজল গোস্বামী, গোপাল কুণ্ডু, পরেশ চন্দ্র সরকার, তাপস সুকুল এবং রামচন্দ্র সরকার। পথসভা শেষে গাজোল থানার আইসিকে প্রতিবাদ পত্র প্রদান করা হয়। শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন নিখিল চন্দ্র মজুমদার।

অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘ বার্ষিক সাধারণ সভা

গত ২৮ মে অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘ (বিদ্যালয় শিক্ষা) পূর্ব বর্ধমান জেলার বার্ষিক সাধারণ সভা বর্ধমান শহরের উদয়চাঁদ জেলা গ্রন্থাগারে অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সভাপতি আশিস মণ্ডল, রাজ্য সহ সভাপতি শিবমুনি সাউ, রাজ্য সাধারণ সম্পাদক বাপি প্রামাণিক, রাজ্য সম্পাদক কৌশিক সরকার, রাজ্য যুগ্ম সম্পাদক তারাশঙ্কর চক্রবর্তী, বিভাগ প্রমুখ মধুসূদন মণ্ডল এবং সহ বিভাগ প্রমুখ রাজকুমার রায়। বিশেষ অতিথি রূপে ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বর্ধমান জেলা সঙ্ঘচালক তুষারকান্তি হাজরা। সভায় জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয় থেকে ১২৮ জন শিক্ষক, শিক্ষিকা এবং শিক্ষাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

শিক্ষকদের পেশাগত সমস্যার পাশাপাশি শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতিতে শিক্ষকদের ভূমিকা, জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। এছাড়া বিগত বছরের কাজের সমীক্ষা এবং আগামী বছরের কাজের যোজনাও করা হয়।

ভারতীয় সংস্কৃতি ন্যাস নিবেদিত সংস্কৃতি সন্ধ্যা—ভক্তকবি নজরুল

গত ২৯ মে সন্ধ্যায় কলকাতা বিবেকানন্দ রোডস্থিত বিবেকানন্দ সোসাইটি হলে ভারতীয় সংস্কৃতি ন্যাসের উদ্যোগে এক সংস্কৃতি সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়। ভক্তকবি

নজরুল শীর্ষক অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. সরূপ প্রসাদ ঘোষ বলেন, ভক্তকবি কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন কালোত্তীর্ণ, জাতীয়তাবাদী, দেশপ্রেমিক, সাম্যবাদী ভাবনায় অনুপ্রাণিত, জাতীয় সংকটকালে দেশবাসীকে উজ্জীবিত করার অভয়মন্ত্র দাতা সাধক কবি। পশ্চিমবঙ্গের আর এক মনীষী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর সুসম্পর্ক ছিল। এরপর কাজী নজরুলের ছ'টি ভক্তিসংগীত --- 'অঞ্জলি লহো মোর', 'খেলিছ এ বিশ্ব লয়ে', 'আমি নূতন করে গড়বো ঠাকুর', 'হৃদি পদ্মে চরণ রাখো', 'ওরে নীল যমুনার জল' এবং 'হে গোবিন্দ রাখো চরণে' পরিবেশন করেন যথাক্রমে শ্রদ্ধা মণ্ডল, সুনীতা রায় কর্মকার, প্রমিতি রায়, পারমিতা নিয়োগী, তনুশ্রী মল্লিক এবং আঁকন মজুমদার। প্রাককথনে ছিলেন সুভাষ ভট্টাচার্য। মঞ্চ ও প্রদীপ প্রজ্বলন ব্যবস্থায় ছিলেন আশা বসাক ও মল্লিকা রায়। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন অনিমা দাস মজুমদার। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন গোপাল কুণ্ডু। সোমা চক্রবর্তী পরিবেশিত পূর্ণ বন্দেমাতরম্ গায়নের পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

শিলিগুড়ি সারদা শিশুতীর্থের সংকল্প দিবস উদ্‌যাপন

পূর্ব ভারতের বিদ্যা ভারতী অনুমোদিত প্রথম বিদ্যালয় শিলিগুড়ি সূর্যসেন কলোনির সারদা শিশুতীর্থের আগামী ৫ সেপ্টেম্বর সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপনের প্রাকপর্বে গত ২৪ মে বুদ্ধপূর্ণিমার পবিত্র দিনে পালিত হলো সংকল্প দিবস। ভগবান বিষ্ণুর পূজা অর্চনা, যজ্ঞ এবং সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষকে সার্থক করে তোলার আলোচনা বার্তার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটি সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে ওঠে। অনুষ্ঠানে সমিতির সমস্ত সদস্য, আচার্য-আচার্যা, মাতৃভারতী, প্রাজ্ঞ ভারতী, প্রাক্তন বিদ্যার্থী সঙ্ঘের প্রতিনিধি এবং পার্শ্ববর্তী অন্যান্য শিশুতীর্থের প্রতিনিধিরা উপস্থিত থেকে বিভিন্ন আলোচনাকে পূর্ণাঙ্গ করে তোলেন। স্বাগত ভাষণ দেন বিজয় কুমার সাহা। সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষকে সাফল্যমণ্ডিত করতে সকলের অংশগ্রহণ কামনা করেন বিমলকৃষ্ণ দাস। সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষের উদ্বোধনের দিন ধার্য করা হয়।

কলকাতায় বীর সাভারকর জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন

বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার ১৬২ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রিট কলকাতা -১২ স্থিত নিজস্ব কার্যালয়ে গত ২৮ মে পালিত হলো স্বাতন্ত্র্যবীর বিনায়ক দামোদর সাভারকরের ১৪১ তম জন্মজয়ন্তী। বিশিষ্ট সাভারকর গবেষক ও সমাজসেবী সন্দীপ মুখার্জীর হাতে অনুষ্ঠানটির শুভারম্ভ হয়। তিনি বীর সাভারকরকে অখণ্ড ভারত স্বাধীনতা আন্দোলনকারীদের অগ্রগণ্য, ইতিহাসবিদ, দার্শনিক, সমাজ সংস্কারক এবং সাহিত্যিক রূপে তুলে ধরেন। অফিস সম্পাদক অঞ্জন ব্যানার্জী, সংগঠন সম্পাদক অনন্ত সিংহরায়, আধিকারিক হিংলাজ চট্টোপাধ্যায়, অ্যাডভোকেট সুবোধ দাস, অসিত কুমার সিংহ, শর্মিষ্ঠা রায়, রাজলক্ষ্মী বিশ্বাস, চন্দন সোনকার, সুদীপ চক্রবর্তী, সুবীর জয়সোয়াল প্রমুখ শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন।

ফল হারিণী তিনি ফলদায়িনী

নন্দলাল ভট্টাচার্য

জ্যৈষ্ঠের কালী

জ্যৈষ্ঠের অমানিশা। মাতৃসাধনার এক মাহেন্দ্রক্ষণ। মন্দিরে মন্দিরে, সাধকের সাধনস্থানে অথবা গৃহস্থগৃহে হয় আয়োজন ফলহারিণী কালীপূজা। দীপান্বিতা, রটন্তী বা পৌষকালী পূজার মতোই বাঙ্গালির বহু গৃহেই হয় ফলহারিণী কালীপূজা।

নাম থেকেই বোঝা যায়, ফলহারিণী কালীপূজায় দেবী হরণ করেন পূজকের কর্মফল। তবে দেবী তো মা, তাই তিনি কেবল নেন না, দেনও। এই পূজায় দেবী কালিকা হরণ করেন সকলের কর্মফল আর দেন ধন, ঐশ্বর্য, সম্পদ এবং অবশ্যই দেন সাধকের সাধনার ফল— মুক্তি। এই পূজায় নিবেদন করা হয় চারটি বিশেষ ফল। মরসুমি সে সব ফল। তবে একই সঙ্গে এই পূজায় জড়িত রয়েছে— ধর্ম-অর্থ- কাম-মোক্ষ। এই চারটি ফলই পাওয়া যায় ফলহারিণী কালীর আরাধনায়।

ফলহারিণী কালী— মুক্তিদায়িনী, কর্মফল হরণ কারিণী। কিন্তু এই পূজার জন্য নেই কোনো আলাদা বা বিশেষ মন্ত্র। দক্ষিণাকালী পূজার বিধি অনুযায়ীই করা হয় দেবীর অর্চনা। ভারতে শক্তি সাধনার রয়েছে তিনটি ধারা। এই ত্রিধারা প্রবাহিত হচ্ছে বিন্ধ্য পর্বতকে কেন্দ্র করে। বিন্ধ্য থেকে দক্ষিণে বয়ে যাওয়া ধারাটির নাম অশ্বক্রান্তা। একই ভাবে বিন্ধ্য থেকে উত্তরে কাশ্মীর পর্যন্ত বহমান ধারাটির নাম রথক্রান্তা। অন্যদিকে, চট্টগ্রাম পর্যন্ত পূর্বাঞ্চলের ধারাটির নাম বিষ্ণুক্রান্তা। বঙ্গদেশে প্রচলিত রয়েছে এই বিষ্ণুক্রান্তা ধারাটি। তবে এখানে বিষ্ণুক্রান্তা অনুসারী মাতৃসাধনার যে ধারাটি রয়েছে তাকে বলা হয় কালীকুল। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মাতৃসাধনা হয়েছিল ওই কালীকুল ধারাতেই।

তিনিই কাল, তিনিই কালী

এক তিনি, বহু হলেন। বহু তিনি, এক হলেন, এ এক আশ্চর্য খেলা। কত না কথা লুকিয়ে আছে এর মধ্যে। আসা-যাওয়া ও থাকা— এই তিন নিয়েই তো জীবন। জীবনকে নিয়ে এমন খেলা খেলেন যিনি— তিনিই তো কাল। আবার কালই-তো কালী। এমনই সিদ্ধান্ত অধ্যাত্ম পথযাত্রীদের। এটাই তো পরমাত্মার লীলা। তাঁর খেলাতেই কাল হন পরমপুরুষ, কালী হন পরমা প্রকৃতি। এই পুরুষ আর প্রকৃতিই হলো এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আসল কুশীলব। তাঁদের মিলনেই তো এই বিশ্বজগৎ এতো সুন্দর— এত স্বপ্নময়।

তন্ত্রসাধকদের মতে কালীই হচ্ছেন এই জগতের সবকিছুর মূল কারণ। কালীর কথা বলতে গিয়ে বলা হয়, কালকে যিনি হরণ করেন, তিনিই কালী। কালীই আদি-পরাশক্তি। তিনিই পরব্রহ্ম। এমনই বলা হয়েছে ঋগ্বেদে। সমস্ত জীবের জননী কালীই শক্তির চূড়ান্ত প্রকাশ। অশুভের বিনাশকারী— যিনি শুভের প্রতিষ্ঠাতা। তিনিই চতুর্বর্গ ফল অর্থাৎ ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ প্রদায়িনী।

কালী হলেন বিশ্বজননী। স্বাভাবিক ভাবেই সন্তানের সব চাহিদা পূরণ করেন তিনি। তিনি দেন, আবার দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হরণও করেন। হরণ করেন সন্তানের কর্মফল, তার সর্ব পাপ। তাই তিনি ফলহারিণী। আবার তিনি ফলদায়িনী। আর এই দুই রূপেই তিনি মুক্তমনা— তিনি নেন সন্তানের পূজা। ভক্তির মূল্যে সন্তান লাভ করে তাঁর অফুরন্ত কৃপা। আবার সন্তানের মঙ্গলের জন্যই তিনি কল্মষহারিণী। সন্তানের পাপ হরণের জন্যই তাঁর এই ফলহারিণী রূপে অবতরণ— এই রূপেই মঙ্গল করেন তিনি সন্তানের। এই রূপেই তিনি গ্রহণ করেন সন্তানের পূজা, পূরণ করেন সব প্রার্থনা। তিনি কেবল ফলই হরণ করেন না, ফল দেবার জন্যও সতত ব্যগ্র। তাই তাঁর আবির্ভাব ফলহারিণী রূপে।

মায়াতন্ত্রের সপ্তদশ পর্বে আছে, জ্যৈষ্ঠ মাসি অময়াং মধ্যরাত্রে মহেশ্বরি। পূজয়েত কালিকাদেবীং নানা দ্রব্যোপহরিকৈঃ।। —জ্যেষ্ঠ মাসের অমাবস্যার মধ্যরাত্রে আম, জাম ইত্যাদি মরসুমি ফল দিয়ে করতে হয় দেবীর পূজা। তাতেই হয় অভীষ্ট লাভ। একই কথা বলা হয়েছে ক্রিয়াকাণ্ড বারিধিতেও— জ্যৈষ্ঠমাসি তথা মায়াং সফলং কালিকার্চনা। জ্যেষ্ঠ মাসের অমাবস্যায় কালিকা দেবীর যে অর্চনা করা হয় তারই নাম ফলহারিণী কালীপূজা। এ পূজা সাধককে দেয় সিদ্ধি, গৃহস্থকে দেয় ঋদ্ধি।

কালীক্ষেত্রে ফলহারিণী পূজা

কালীক্ষেত্র কালীঘাট আর দক্ষিণেশ্বর। মাতৃসাধনার একটি সরলরেখার দুই প্রান্তে রয়েছে এই দুই স্থান। ফলহারিণী কালীপূজার ক্ষেত্রে এই দুটি জায়গারই রয়েছে বিশেষ গুরুত্ব। বলা যায় বঙ্গের মাতৃসাধনার ইতিহাসে এই দুটি স্থান যেন কাঞ্চনপ্রভা বিচ্ছুরিত দুটি নক্ষত্র।

কালীঘাটে ফলহারিণী পূজা হয় জ্যৈষ্ঠ মাসের অমাবস্যার মধ্যরাতে। ওই দিনে দেবীকে সাজানো হয় পুরোটাই রজত আভরণে। মায়ের মাথায় পরানো হয় বিশাল এক রুপোর মুকুট। গলায় ঝোলানো হয় রুপোর হার। অঙ্গে দেওয়া হয় রুপোরই নানা আভরণ। এমনকী মায়ের প্রসারিত জিহ্বাটিও আবৃত করা হয় রুপোরই পাত দিয়ে। এবার রুপোর বিরাট এক থালায় নানারকম ফলমূল সাজিয়ে প্রধান পুরোহিত করেন ফলহারিণী কালীর পূজা। নানা কারণেই অমানিশার মধ্য যামে অনুষ্ঠিত দেবীর এই অর্চনা ভক্তিরসে আপ্লুত করে সকলকেই। মধ্যরাতের এই ফলহারিণী কালীপূজা কালীক্ষেত্র কালীঘাটের একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ অনুষ্ঠান। বিশেষ করে শাক্তসাধকরা কালীঘাটের এই ফলহারিণী কালীপূজার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান। মাতৃদর্শন এবং পূজন ও ধ্যানের মধ্য দিয়ে অধ্যাত্ম পথে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা পান তাঁরা। এই কারণে কালীঘাটে ফলহারিণী কালীপূজার দিন শাক্ত সাধক-সাধিকাদের সমাবেশ নজরে পড়ার মতো। বস্তুত দীপান্বিতা কালীপূজার মতোই ফলহারিণী কালীপূজার দিনেও নামে ভক্তদের ঢল। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকেই ভক্তরা আসেন এখানে ফলহারিণী কালীপূজার সুফল পাওয়ার আশা নিয়ে। পূর্ণকামও হন তাঁরা।

শ্রীরামকৃষ্ণের সারদা-পূজা

নতুনতীর্থ দক্ষিণেশ্বর। ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের ৩১ মে স্নানযাত্রার দিনে প্রতিষ্ঠিত হয় রানি রাসমণির ভবতারিণীর মন্দির। শুরু হয় দেবীর নিত্যপূজা। এই মন্দিরে দৈবী কারণেই দেবীর পুরোহিত পদে ব্রতী হন শ্রীরামকৃষ্ণ। শুরু হয় তাঁর মাতৃসাধনা।

ভবতারিণী মন্দিরে নিত্যপূজার বাইরে বিশেষ পূজার্চনা হয় বছরে তিনদিন সেই প্রথম থেকেই। কার্তিকে দীপান্বিতা শ্যামাপূজা, মাঘে রটন্তী কালীপূজা এবং জ্যৈষ্ঠে ফলহারিণী কালীপূজা। ওই তিন দিন মন্দিরে হয় বিশেষ পূজা।

সেই পূজার ধারায় এল ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দ তথা ১২৮০ বঙ্গাব্দের ১৩ই জ্যৈষ্ঠ। সেদিন ছিল ফলহারিণী কালীপূজা। মন্দিরে যথারীতি হলো পূজার আয়োজন। একই সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ঘরে করলেন এক বিশেষ পূজার ব্যবস্থা। একান্ত গোপনে। সে এক অভিনব পূজা। আপন সহধর্মিণীকেই পূজা করলেন তিনি ষোড়শী রূপে। সেদিন রাতে নিজের ঘরে পূজায় বসলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁর সামনে আলপনা দেওয়া জলচৌকির ওপর বসলেন মা সারদা দেবী। তিনি তখন প্রায় বাহ্যজ্ঞানশূন্য। সামনের কলসের মন্ত্রপূত জল দিয়ে বারবার অভিষিক্ত করলেন তিনি দেবী সারদাকে। উচ্চারিত হতে থাকে মন্ত্র। মন্ত্র পাঠ শেষে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রার্থনা— 'হে বালে, হে সর্বশক্তির অধীশ্বরী মাতঃ ত্রিপুরাসুন্দরী, সিদ্ধিদ্বার উন্মুক্ত করো। ইহার শরীর মনকে পবিত্র করিয়া ইহাতে আবির্ভূতা হইয়া সর্বকল্যাণ সাধন করো।'

এরপর শুরু ষোড়শোপচারে পূজা। মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে সমাধিস্থ হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ, সারদাদেবীও। কেটে গেল অমানিশার দ্বিতীয় প্রহর। এবার আত্মনিবেদন করে সাধনার ফল ও জপমালা ইত্যাদি দেবী চরণে অর্পণ করে হলেন প্রণত। এরপর শেষ হলো পূজা।

মূর্তিমতী বিদ্যারূপিণী দেবী সারদার মানবীয় দেহ অবলম্বনে শ্রীরামকৃষ্ণ করলেন এক ঈশ্বরীয় উপাসনা। পরিসমাপ্ত সব সাধনা। মানুষ থেকে দেবতায় উন্নীত হলেন তিনি। হলেন অবতারবরিষ্ঠ। পূজা শেষে সমাধি ভাঙল সারদাদেবীর। মনে মনে শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রণাম করে চলে গেলেন তিনি নহবতখানায় নিজের ঘরে। বস্তুত সেই রাতেই সারদাদেবীও প্রতিষ্ঠিত হলেন দেবীত্বে। শুরু হলো আগামীর কর্মসাধনাও।

কেন এই পূজা?

সারদা দেবীকে আরাধ্যার আসনে বসিয়ে পূজা করলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তন্ত্রসাধনায় এ অবশ্য কোনো নতুন বিষয় নয়। তবুও প্রশ্ন ওঠে, নিজের সাধনায় সিদ্ধিলাভের জন্যই কি স্ত্রীকে পূজা করলেন শ্রীরামকৃষ্ণ? নাকি এর পেছনে ছিল অন্য কোনো উদ্দেশ্য।

সারদাদেবী যে মহা-আধার একথা জানতেন শ্রীরামকৃষ্ণ। কিন্তু সারদা দেবী নিজেও কি জানতেন সে কথা? উত্তরটা এক কথায় দেওয়া একটা অসম্ভব ব্যাপার। নিজের দৈবীসত্তার কথা হয়তো অজানা ছিল না সারদাদেবীর। সেটাই স্বাভাবিক। দৈবী সত্তার অধিকারীদের নিজেদের অজান্তেই ঘটে নানা অলৌকিক প্রকাশ। সারদা দেবীর ক্ষেত্রেও ঘটেছিল সেটাই। সে তাঁর শৈশবকাল থেকেই। কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে সেটা বোঝা সম্ভব নয়। তাই শিশু বয়সের খেয়াল বা চাপল্য বলেই সস্নেহ প্রশ্রয়ে উড়িয়ে দিয়েছেন সকলে সেসব কথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু প্রথম দেখেই স্ত্রীর দেবীসত্তায় ছিলেন স্থির। সে কথা বলেওছেন বহুবার নানা কথার ছলে। কিন্তু সে কথার গুরুত্ব তখনও বুঝতে পারেননি তাঁর পার্শ্বচররাও। তাই শ্রীরামকৃষ্ণের এই লীলাভিনয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ যখন সারদাদেবীকে পূজা করেন, তখনও শুরু হয়নি ভাবান্দোলনের প্রচার। নরেন-রাখালের দল সবে

আসা-যাওয়া শুরু করেছেন দক্ষিণেশ্বরে। শ্রীরামকৃষ্ণ জানতেন, এঁরাই তাঁর মানস সন্তান। এঁরাই গড়ে তুলবেন এমন এক সঙ্ঘ— যা দিকে দিকে ওড়াবে ভারতের অধ্যাত্মসাধনার বিজয় পতাকা। সে সময় তিনি থাকবেন না। কিন্তু তাঁরই নামাঙ্কিত সঙ্ঘকে লালনপালন করতে হবে সারদা দেবীকে। তাই তাঁর মধ্যে রয়েছে যে দেবীত্ব তাঁর পূর্ণ প্রকাশ ঘটাতে, দেবীরূপে তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণের ওই অভিনব অর্চনা। দশমহাবিদ্যার তৃতীয় বিদ্যা— ষোড়শী রূপে তাই তাঁর ওই আরাধনা। সেটা ওই ফলহারিণী কালীপূজার রাতে— সর্বফল পাওয়ার পুণ্যক্ষণে। সার্থক তাঁর সাধনা। সারদামণি হয়ে উঠলেন দেবী সারদা। রূপান্তরিত হলেন আগামীর সঙ্ঘ জননীতে।

কে দেবী ষোড়শী

ফলহারিণী কালীপূজার মধ্যরাতে শ্রীরামকৃষ্ণ পূজা করলেন সহধর্মিণীকে— ষোড়শী রূপে, কিন্তু কে এই ষোড়শী? উত্তর, নিরাকার আদ্যাশক্তির দশটি সাকার রূপেই সমষ্টিগত নাম দশমহাবিদ্যা। এই দশনাম দেবী পার্বতীরই দশটি স্বরূপ। দেবীত্বের এই ক্রমবিকাশের ধারায় আছে ভয়ংকরী দেবী মূর্তি, তেমনই আছে অপরূপা— সুন্দরী দেবী প্রতিমা। এই দেবী শক্তির এই দশটি সত্তার প্রকাশ ক্রমে ষোড়শীর স্থান তৃতীয়।

ষোড়শীর অন্য নাম ললিতাম্বা ত্রিপুরাসুন্দরী। ইনি পূর্ণতার এক দিব্যস্বরূপ। মহাগৌরী বা পার্বতী নামেও পরিচিতা তিনি তন্ত্রসাধকদের কাছে। তন্ত্রমতে, দেবী ষোড়শীর অবস্থান— ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না— এই ত্রিপুরে। এই ত্রিপুর হলো মন, চিত্ত ও বুদ্ধির অপরূপ প্রকাশ। দেবী ষোড়শীর গাত্রবর্ণ গলিত সোনার মতো।

ষোড়শী হলেন ষোলো বছরের বালিকার রূপ। ষোলো রকম কামনার প্রতীক তিনি। ষোড়শী তন্ত্রে তাঁকে বলা হয়েছে 'শিবের নয়নজ্যোতি'। মহেশ্বর তাঁর স্ত্রীকে দিয়েছিলেন ষোলো অক্ষরের সবচেয়ে শক্তিশালী ষোড়শাক্ষরী মহামন্ত্র।

ষোড়শী হলেন দেবী ত্রিপুরাসুন্দরী বা ললিতাম্বার ষোড়শ বর্ষীয় রূপ। এর অন্য নাম রাজরাজেশ্বরী। তাঁর হাতের অস্ত্র আখের ধনুক, পঞ্চবাণ, পাশ ও অঙ্কুশ।

ষোড়শী তথা দশমহাবিদ্যার আবির্ভাব সম্পর্কে পুরাণকথা, শিবজায়া সতী বিনা নিমন্ত্রণে পিতা দক্ষের শিবহীন যজ্ঞে যেতে চাইলে মহেশ্বর তাঁকে বাধা দেন। কোনোভাবেই মহাদেবের সম্মতি আদায় করতে না পেরে পলায়নপর সতী মহাদেবকে দশ মহাবিদ্যা রূপে দশ দিক থেকে ঘিরে ধরেন তিনি। বাধ্য হয়েই অনিচ্ছা সত্ত্বেও মত দেন মহাদেব। সতী দক্ষালয় যান। কিন্তু পিতার মুখে পতিনিন্দা শুনতে না পেরে দেহত্যাগ করেন। তারই পরিণতিতে দক্ষযজ্ঞ। নিহত দক্ষের মাথায় বসে ছাগমুণ্ড। গতপ্রাণা সতীকে কাঁধে নিয়ে শিব শুরু করেন প্রলয় নৃত্য। বিষ্ণুচক্রে খণ্ড খণ্ড সতীদেহ ৫১ জায়গায় পড়ে সৃষ্টি হয় সতী পীঠের। মহাদেবও শান্ত হয়ে বসেন ধ্যানে। ওদিকে সতীও জন্ম নেন পার্বতী রূপে। সেসব হলো ভিন্ন কাহিনি। মূল কথা, দশ মহাবিদ্যার তৃতীয় বিদ্যাই হলেন ষোড়শী বা ত্রিপুরাসুন্দরী।

দেবী হলেন ত্রিপুরা সুন্দরী

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ কথা। শিবের ধ্যান ভাঙাতে গিয়ে শিব-রোষে ভস্ম হন মদন। পরে সেই ভস্ম দিয়ে একটি পুতুল গড়ে রুদ্র সেনাপতি চিত্রকর্মা সেটি নিয়ে যান শিবের কাছে। কী এক খেয়ালে শিব সেই পুতুলে করেন প্রাণ সঞ্চার।

চিত্রকর্মার কথায় শিবের তপস্যা করে সেই বালক পুতুল হয় বিপুল শক্তির অধিকারী। শক্তির দম্ভে মদমত্ত সেই বালক তখন অস্ত্র ধরে দেবতাদেরই বিরুদ্ধে। এই সব ঘটনাই প্রত্যক্ষ করেছিলেন ব্রহ্মা। ভস্ম দিয়ে গড়া পুতুলের প্রাণ পেয়ে এমন ধর্মবিরুদ্ধ কাজে ক্রুদ্ধ হয়ে ব্রহ্মা তাকে বলেন, ভণ্ড, ভণ্ডক। আর তার থেকেই তার নাম হয় ভণ্ডাসুর।

মদমত্ত ভণ্ডাসুর এক সময় ইন্দ্রাণী শচীকে জোর করে বিয়ে করতে চায়। ভীত শচী কৈলাসে গিয়ে দেবী পার্বতীর আশ্রয় নেন। ওদিকে ভণ্ডাসুর তার সেন্যদল নিয়ে কৈলাস আক্রমণ করে। দেবতাদের স্তবে তুষ্ট দেবী পার্বতী ক্রুদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করতে গেলে ব্রহ্মা তাঁকে বাধা দেন। শিবও সে সময়ে কৈলাসে এসে ভণ্ডাসুরকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেন।

ভণ্ডাসুরের অত্যাচার কিন্তু বেড়েই চলে। সেই সময় নিদ্রা থেকে উত্থিত বিষ্ণু বলেন, একমাত্র মহাশক্তি মহামায়া পার্বতীই বধ করতে পারবেন ওই অধার্মিক ভণ্ডাসুরকে। তাঁর কথায়, ব্রহ্মা, মহেশ্বর-সহ দেবতারা মর্ত্যে গিয়ে পার্বতীর উপাসনা করতে থাকেন। বর্তমান ত্রিপুরা ছিল সেই উপাসনাস্থল। দেব আরাধনায় তুষ্ট পার্বতীর যজ্ঞ থেকে উত্থিত হন ললিতা ত্রিপুরাসুন্দরী রূপে। আর তা থেকেই ওই জায়গার নাম হয় ত্রিপুরা। এরপর দেবীদেহ থেকে বেরিয়ে আসেন চণ্ডী, কালী, তারা, কালামুখী, কালরাত্রি। শুরু হয় যুদ্ধ। যুদ্ধে দেবী ত্রিপুরাসুন্দরী বধ করেন ভণ্ডাসুরকে।

পঞ্চকোটে আজও

পঞ্চকোট রাজবাড়িতে পূজিতা হন দেবী ষোড়শী এখনও। কিংবদন্তী, সেনবংশের রাজা বল্লাল সেনের মেয়ে সাধনার সঙ্গে বিয়ে হয় পঞ্চকোটের কাশীপুররাজ কল্যাণ শেখরের। রাজকন্যা সাধনা পিত্রালয়ে পূজা করতেন কুলদেবী শ্যামরূপার। স্বামীর ঘরে যাওয়ার সময় তিনি সেটি নিয়ে যেতে চান। বল্লালসেন মত দেন তাতে।

সাধনা কুলদেবীকে নিয়ে যাওয়ায় ক্রুদ্ধ হন লক্ষ্মণসেন। তিনি কাশীপুরে যান যুদ্ধ করে দেবীকে ফিরিয়ে আনার জন্য। হেরে যান লক্ষ্মণ সেন। ফিরে যান রাজধানীতে।

ওদিকে গুহা থেকে দেবীমূর্তি আনতে গিয়ে দেখেন, দেবী সেই পাহাড়ের গুহায় অচল অটল হয়ে গেছেন। বাধ্য হয়ে সেখানেই গড়া হয় মন্দির— নাম হয় কল্যাণেশ্বরী। দেবীর নির্দেশে ফিরে যান রাজরানি রাজধানীতে। সেখানেই প্রতিষ্ঠিত হয় দেবীর এক ষোড়শী মূর্তির। নাম হয় রাজরাজেশ্বরী। এখনও সেখানেই পূজিতা ষোড়শী রাজরাজেশ্বরী।

ফলহারিণী কালীপূজা প্রসঙ্গেই এসে পড়ে এসব কথা যা শাশ্বত— চিরকালীন। যা ভারতবর্ষেরই এক বর্ণালী বর্ণন। □

বলির মাংস প্রসাদস্বরূপ

অচিন্ত্যরতন দেবতীর্থ

এই জগতে জন্মগ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে ত্রিতাপের অধীনস্থ থাকতে হয়। এই ত্রিতাপ হচ্ছে— আধ্যাত্মিক, আধিবৈদিক, আধিভৌতিক। ত্রিতাপ হরণ করেন রাম (হরি বা কৃষ্ণ)। রাম মানে এক। চাই একত্ব বা এক স্বরূপত্ব। 'মুঁইতেঁই শ্রীচৈতন্য' অর্থাৎ আমিই ঈশ্বর।

মাংসে রয়েছে শরীর সুস্থ রাখার নানা উপাদান। এর নানা গুণ ও অচিন্ত্য শক্তিও আছে। বিজ্ঞান মতে মাংস অতিশয় শুভ স্বাস্থ্যকর, এতে বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা আছে। তবে স্বাস্থ্যরক্ষার বিধান অনুযায়ী এবং শরীর অনুপাতে মাংস খেতে হয়। সনাতন হিন্দু শাস্ত্রমতে বার, তিথি, পর্বতিথি (অষ্টমী, একাদশী, চতুর্দশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও সংক্রান্তি) না মেনে মাংস খেলে জটিল রোগের সৃষ্টি হয়।

মাংস যে খায়, মাংস তাকে খায়। নিহত পশুরা পরজন্মে (পরলোকে) মাংস ভক্ষণকারীকে ভক্ষণ করে— (দ্র: মহাভারত অনু-১১৬, ভাগবত-৪/২৫-২৮)। শাম্বপুরাণে ভগবান শিব স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, 'রবিবারে মাংস খেলে চিররোগী হয়'। ভাগবতে দেবর্ষি নারদ বলেছেন, ডিম ও মোরগ যবন ও ম্লেচ্ছদের খাদ্য; যা খাবে এবং যার খাবে তার স্বভাব পাবে'।

বৈদিক ও তন্ত্রশাস্ত্রগুলিতে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে পশু উৎসর্গের বিধান আছে। দেবতাদের ও পিতৃগণের তৃপ্তির দ্বারা মানুষের কল্যাণ হয় এবং কামনা-বাসনা পরিতৃপ্তি হয়। সাধারণ মানুষ স্বভাবতই কর্মে আসক্ত। নিজের প্রকৃতি ও স্বভাব অনুসারে ব্যক্তি কর্মে নিযুক্ত হয়ে থাকে। কর্ম করলেই তার ফল উৎপাদন হবে। সুকর্মে সুফল আর কুকর্মে কুফল লাভ হয়। এই মানব প্রকৃতির পরিবর্তনই হচ্ছে তপস্যা। দেবী ভাগবতে বলা হয়েছে, 'সুরথ রাজা লক্ষ বলি দিয়ে দুর্গাপূজা করেছিলেন। ফলে ওই লক্ষ পাঁঠা তাঁকে এক কোপে কেটেছিল। তাঁকে আর লক্ষবার বলি হতে হলো না। এই ভাবে প্রারব্ধের ভোগ হলো। ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে কর্ম করলে এইটুকু লাভ হয়।

জগতে অহিংসক কেউ নেই। ধ্যানাদি শস্যবীজ এবং জীব, প্রাণী পরস্পরকে ভক্ষণ করে জীবিত থাকে। একে খাদ্যশৃঙ্খল বলা হয়। যথাবিধানে মাংস খেলে পাপ হয় না। মাংসে দেবতা, পিতৃগণ, অতিথি ও পরিজনদের সেবা হয়। এতে নিহত পশুরও কর্মফল শেষ হয়। বেদে আছে— অন্নের ন্যায় ওষুধিলতা, পশুপক্ষীও মানুষের খাদ্য। যুগস্রষ্টা শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন— 'বিধিবাদীয় বলিতে দোষ নেই।' দেবতার প্রসাদে কোনো দোষ হয় না। অর্থাৎ বলির মাংস প্রসাদ রূপে গ্রহণ করতে হয়। শাস্ত্র জ্ঞান অকল্যাণকে শান্ত করে। ভালো থাকার সহজ উপায় সত্যানুসন্ধান করতে হবে। সত্যানুসন্ধানে খাদ্য গ্রহণ করলে দোষ হয় না।

(লেখক ধর্ম ও জ্যোতিষ গবেষক)

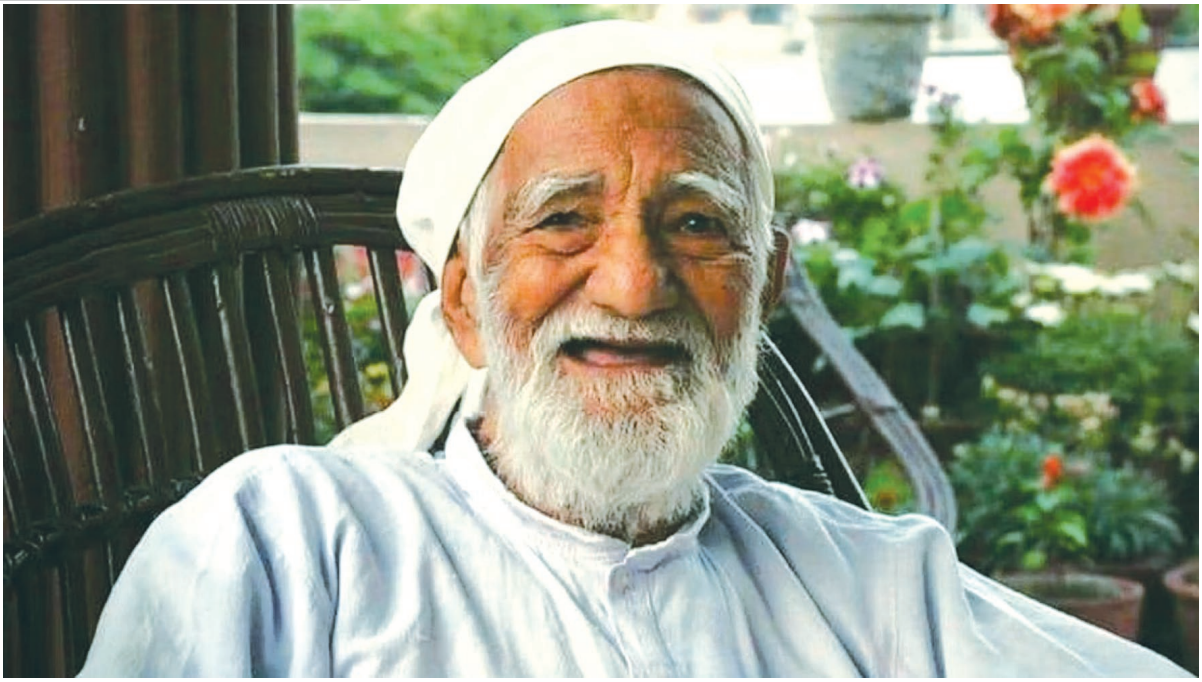

চিপ্‌কো আন্দোলনের পথিকৃৎ

সুন্দরলাল বহুগুণা

কর্মযোগী মানুষ ছিলেন সুন্দরলাল বহুগুণা। সারাজীবন প্রকৃতিকে ভালোবেসেছেন। এজন্য আমৃত্যু সংগ্রামও করে গেছেন।

ড. সর্বাণী চক্রবর্তী

গাছ আমাদের মিতা
ও ভাই, গাছই মাতা পিতা
গাছ আমাদের বাঁচায় জীবন,
দু-হাতে দেয় বুকভরা ধন,
আমরা ভুলব কি তা?
গাছ আমাদের মিতা।

—গোবিন্দ মোদক

সত্যি, গাছ আমাদের পিতা-মাতার মতো স্নেহে আমাদের জীবনকে ভরিয়ে দেয়। এককথায় গাছ আমাদের প্রাণবায়ু। গাছের ফুল-ফল আমাদের জীবনকে বাঁচিয়ে রাখে। সুতরাং এর প্রয়োজনীয়তার কথা বলাই বাহুল্য। আজ এমনই একজন প্রকৃতিপ্রেমিকের কথা বলব। যাঁর নাম সুন্দরলাল বহুগুণা। প্রকৃত নাম সুন্দরলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ছিলেন ভারতের পরিবেশ সুরক্ষা আন্দোলনের অগ্রদূত। তাঁর জন্ম গাড়োয়ালের মারোরা গ্রামে। জন্ম ১৯২৭ সালের ৯ জানুয়ারি। বাড়ির পাশেই ছিল প্রবাহমান গঙ্গা। তাই আজীবন গঙ্গার প্রতি ছিল গভীর প্রেম। অন্যান্য গ্রাম্য ছেলেদের মতো তিনিও তাঁর গ্রামের স্কুলেই পড়াশোনা করেন। এরপর ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেই চলে যান লাহোরের সনাতন ধর্ম (এসডি) কলেজে। সেখান থেকে বি.এ. পাশ করেন।

তখন দেশ জুড়ে চলছে স্বাধীনতা আন্দোলনের ঝড়। তাঁর বয়স মাত্র ১৭ বছর। গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ আন্দোলনে নিজেকে সঁপে দিলেন। ব্রিটিশ সরকারের কাছে তা আর গোপন রইল না। ধরা পড়লেন। জেল হলো পাঁচ মাস। জেল

থেকে বেরিয়ে তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনে পুরোপুরি নিজেকে জড়িয়ে ফেলেন। ক্রমে জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক হলেন। সেই সময় একদিকে ছিল জাতের বিচার, অন্যদিকে ছিল ছোঁয়াছুঁয়ির বিধিনিষেধ যা সমাজকে ক্রমশ ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছিল। তখন নীচু জাতের মানুষের মন্দিরে প্রবেশ করার অনুমতি ছিল না। তিনি বিভেদের বেড়াজাল ভেঙে দেশকে বাঁচানোর কথা চিন্তা করলেন। গান্ধীজীর অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে লড়াইকে স্বাগত জানিয়ে অগ্রসর হলেন। পরে গান্ধীজীর বিদেশি শিষ্যা মীরা বেনের সঙ্গে পরিচয় হলো।

তিনিই সুন্দরলালকে এই কাজে উপযুক্ত ভেবে নির্দেশ দিলেন— 'প্রথমে গ্রামের মানুষদের সেবা কর। তাদের সুবিধা-অসুবিধার কথা ভেবে নিজেকে সমর্পণ কর। কারণ, গ্রামের উন্নতি না হলে দেশের উন্নতির কথা ভাবা বৃথা'।

মীরার একমাত্র সঙ্গিনী ছিলেন বিমলা। গান্ধীজীর সেবার আদর্শকে ধ্রুবতারা হিসেবে জীবনে তাঁর পথ চলা। তাঁকে দেখে ও তাঁর কাজকর্ম দেখে সুন্দরলালের ভালো লেগে গেল। আবদ্ধ হলেন দু'জনে বিবাহ বন্ধনে। এ যেন স্রষ্টারই নতুন ইঙ্গিত দু'জনের পথ চলতে। পথ তাঁদের বেঁধে দিল জীবনের যাত্রাকে। এ শুধু নারী-পুরুষের মিলন নয়। তাঁদের কর্মযজ্ঞে দুজনের চলল কঠোর সাধনা। তাঁরা বাড়ির কাছেই গড়ে তুললেন 'নবজীবন আশ্রম।' গ্রামের মানুষদের সুখ-দুঃখের ভাগীদার তাঁরা। মানুষদের শিক্ষা দিতেন, অসুস্থ হলে সেবা করতেন। সামান্য উপার্জনেই চলত তাঁদের সেবা কাজ। তাঁরা দু'জনেই বিশ্বাস করতেন সক্রিয় রাজনীতিতে যোগ না দিয়ে গান্ধীজীর আদর্শেই দেশ ও জাতির একমাত্র কল্যাণ হতে পারে।

এরপরে তাঁদের সঙ্গে পরিচয় হলো আচার্য বিনোবা ভাবের। বিনোবাজীরও ভালো লাগলো এঁদের দু'জনকে দেখে। বিনোবা ভাবে ছিলেন গান্ধীজীর মতাদর্শে বিশ্বাসী। তাই সুন্দরলালের মনে হয়েছে— ইনি যেন গান্ধীজীর জীবন্ত প্রতিমূর্তি। এরপর শুরু হলো তাদের পথ চলা। কারও দয়া নয়, একমাত্র নিজেদের প্রচেষ্টাতে হবে এদেশের তথা গ্রাম বা দেশের অভাব মোচন। শুরু হলো গ্রামে গ্রামে গিয়ে মানুষদের সুখ-দুঃখের কথা শোনা। কারও বাড়িতে থেকে তাদের অভাবের কথা, দুঃখ-কষ্টের কথা মন দিয়ে শুনতেন। তাদের বোঝাতেন কী করে প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়। বিশেষ করে একটা জিনিস সুন্দরলালকে খুব ভাবিয়ে তুলেছিল। তাহলো গ্রামের পুরুষরা পরিশ্রম করে যা আয় করে তার বেশিরভাগটাই মদের পেছনে চলে যায়। এর অনেক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় মেয়েদের। তাই তিনি গ্রামের মেয়েদের নিয়ে নেশাবিরোধী আন্দোলন করে পাঁচ জেলায় মদের দোকান বন্ধ করলেন। সুন্দরলালের জীবনে এক আলো নিয়ে এল। তিনি অনুভব করলেন অহিংস সত্যাগ্রহের শক্তি।

এরপরের ঘটনা সুন্দরলালের জীবনকে এক নতুন পথে চালিত করল। তিনি দেখলেন বিদেশি সাহেবরা বড়ো বড়ো গাছ কেটে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করছেন। অথচ এর ক্ষতির কথা কেউ চিন্তা করছে না। ১৯৭০ সালে হলো বিরাট ক্ষতি। অলকানন্দার জল বেড়ে গিয়ে হলো ৬০ ফুট। বহু গ্রাম জলের স্রোতে ভেসে গেল। মানুষের ক্ষয়ক্ষতি হলো প্রভূত। এর একমাত্র কারণ গাছকাটা। এরপর গ্রামের লোকদের সঙ্ঘবদ্ধভাবে সভা করলেন সুন্দরলাল। এই কাজে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এসেছিল গাড়োয়ালের মেয়েরা। তখন ১৯৭৪ সালের শেষ। সুন্দরলাল শহরে সভা করতে গিয়েছিলেন গাছ কাটার বিরুদ্ধে, তখন একটি মেয়ে এসে খবর দেয় যে— একদল লোক গাছ কাটতে এসেছে।

খবর প্রথম শুনেছিলেন এক বিধবা— নাম গৌরী দেবী। মাত্র বাইশ বছরে তিনি বিধবা হন। ওই জঙ্গলে একটি সন্তানকে নিয়ে আছেন। তিনি তখনই গাঁয়ের মেয়েদের নিয়ে জঙ্গলে রওনা হলেন। একমাত্র শপথ— প্রাণ দেবো, তবু গাছ কাটতে দেবো না। প্রথমে গৌরীদেবী কোম্পানির লোকদের ভালো ভাবে বললেন— 'তোমরা ফিরে যাও। কেউ এই জঙ্গলের গাছ কাটবে না।' পরিষ্কার কথা, গাছ কাটলে ঝরবে রক্ত। কোম্পানির লোক শুনবে কেন! তারাও চেঁচিয়ে বলে উঠলেন— 'গাছ কাটবো। কারও ক্ষমতা নেই আমাদের আটকায়।'

কোম্পানির লোকেরা কুড়ুল নিয়ে এগিয়ে এল। আর তখনই গৌরীদেবী চিৎকার করে বলে উঠলেন— 'চিপ কো পেড়। চিপ কো পেড়'। অর্থাৎ তোমরা এক একটি গাছ জড়িয়ে ধরো। সেদিনের সংগ্রাম রক্তক্ষয়ী ইতিহাস রচনা করেছে। শক্তিমানের সঙ্গে দুর্বলের লড়াই। কোম্পানির কর্মচারীরা গাছ জড়িয়ে থাকা মেয়েদের গায়ে লাঠির ঘা দিয়েও সরাতে পারল না। কারণ, গ্রামের মেয়েদের কাছে সেটা ছিল একমাত্র অস্তিত্বের লড়াই।

সেই সংকট মুহূর্তে এগিয়ে এলেন সুন্দরলাল বহুগুণা ও তাঁর স্ত্রী বিমলা দেবী। তখন তিনি হিমালয়ের মানুষদের কাছে গাছ বাঁচানোর কথা সকলকে জানিয়ে দিলেন। তিনি বললেন হিমালয় এক পবিত্রভূমি। এই সভ্যতার পিতৃস্বরূপ। এরই কোলেপিঠে বেড়ে উঠেছে ভারতবর্ষ। মুনি-ঋষিদের তপস্যা স্থল এই বনভূমি। হিমালয় প্রাণহীন হলে সমগ্র ভারতের প্রাণসত্তা বিনষ্ট হবে। সত্তরের দশকে গাড়োয়াল হিমালয়ের কোলে এই আন্দোলন সংগঠিত করে 'গার্ড অব হিমালয়াজ' সম্মানে ভূষিত হলেন। এরপর সুন্দরলালজী চিপকো আন্দোলনকে হিমালয়ের সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য তিনি নিজে ৫,০০০ কিলোমিটার পথ হেঁটেছেন। তাঁর এই প্রচেষ্টা দেশের সীমানা ছাড়িয়ে পড়ল সারা বিশ্বে। সরকার নড়েচড়ে বসল। আইন হলো হিমালয়ের এক হাজার মিটার উচ্চতার ওপরে গাছ কাটা নিষিদ্ধ।

সুদূর কোহিমা থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত

হাতে লাঠি নিয়ে কাঁধে ঝোলা, পায়ে হেঁটেছেন সুন্দরলাল। সঙ্গে ছিল। কয়েকজন মাত্র সঙ্গীকে সম্বল করে সর্বত্র প্রচার করেছেন— 'জঙ্গল বাঁচাও, তবেই তুমি অক্সিজেন পাবে, জ্বালানির কাঠ, পাতা পাবে, বন্ধ হবে ভূমিক্ষয়, রোধ হবে বন্যা।' তাঁরই ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় শুরু হলো বনসৃজন।

একদিকে গাছ কাটা বন্ধ হলো তো অন্যদিকে দেখা দিল আর এক সমস্যা যা মানুষকে ঠেলে দিল আরও বড়ো আন্দোলনের মুখে। তখন কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে শুরু হলো আর এক কর্মকাণ্ড। গোমুখ, গঙ্গোত্রী, উত্তর কাশী হয়ে নেমে আসা গঙ্গা বয়ে গিয়েছে তেহ্‌রির বুকের উপর দিয়ে। এক সময়ে এখানে ছিল গাড়োয়াল রাজা সুদর্শন শাহের রাজধানী। সরকারি নির্দেশ এল যে পাহাড়ের ওপর হবে বাড়ি নির্মাণ। চারদিকে পাহাড় আর মাঝখানে এই রাজধানীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল বিস্তীর্ণ জনপদ।

স্থির হলো এখানে নদীর বুকে বাঁধ দিয়ে গড়ে উঠবে 'তেহ্‌রি ড্যাম'। এই জলে উৎপাদন হবে জলবিদ্যুৎ। তাহলে গাড়োয়ালের গ্রাম থেকে বিদ্যুৎ পৌঁছে যাবে রাজধানী দিল্লির জনপদে। প্রতিবাদে ফেটে পড়ল সমস্ত গ্রামবাসী। কারণ, বাঁধ দিলে জলের তলায় হারিয়ে যাবে জনপদ। সরকারের পক্ষ থেকে বলা হলো এই বাঁধের ফলে পাহাড়ের ওপর গড়ে উঠবে এক নতুন শহর। অবশ্য এজন্য যারা গৃহহীন হবে তাদের দেওয়া হবে ঘর। তৈরি হবে নতুন কর্মসংস্থান।

সাধারণ মানুষের সামান্য প্রতিবাদে ভারত সরকারের কিছু যায় আসে না। বাঁধ মানে সোনার ডিম পাড়া হাঁস। ১৯৭৮ সালে শুরু হলো বাঁধের কাজ। কিন্তু কিছুদিন পরে বাঁধের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। এর ঠিক ৬ বছর পর ১৯৮৬ সালে রাশিয়া এই বাঁধের কাজে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়।

অবশেষে দুই দেশের যৌথ প্রচেষ্টায় যখন বাঁধ তৈরির প্রকল্প শুরু হলো তখন

সুন্দরলাল বহুগুণা

মঞ্চে প্রবেশ করলেন সুন্দরলাল বহুগুণা। তিনি তখন আমৃত্যু অনশনে বসলেন। তাঁর মুখে একটি কথা— জীবন দেবো, তবু বাঁধ হতে দেব না। কারণ এই বাঁধ হলে প্রকৃতিতে ক্ষতির আশঙ্কাই বেশি। সবচেয়ে বড়ো ক্ষতি হবে যুগযুগান্ত হয়ে বয়ে চলা গঙ্গার। ক্রমে গঙ্গা তার নিজস্ব গতি হারিয়ে ঝিলে পরিণত হবে। এরফল ভোগ করতে হবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে।

অনশনে বসলেন সুন্দরলাল। রাজশক্তির বিরুদ্ধে 'অনশন'ই একমাত্র হাতিয়ার। সারাদিন ধরে লোক আসে। নিরলসভাবে বিমলাদেবী সেবা করে যান সকলের। এদিকে সুন্দরলালের স্বাস্থ্যের অবনতি হতে থাকে। সরকারের পক্ষ থেকে অনুরোধ আসে অনশন বন্ধ করতে। না, সুন্দরলাল বুঝেছেন হিংসা নয়, কোনো মারদাঙ্গা নয়; গঙ্গামাকে বাঁচাতে হলে এছাড়া আর পথ নেই। যারা আসেন তাদেরকে বলেন— 'বন্ধ করো এই কর্মনাশা বাঁধ'। অবশেষে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী এইচ ডি দেবেগৌড়া লিখিতভাবে প্রতিশ্রুতি দিলেন এবং ৭৪ দিন পরে তিনি অনশন ভঙ্গ করেন।

একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। সেই সময় একদল আন্দোলনকারী বাসে করে কোনো একটি সভায় যাচ্ছিল। পাহাড়ি পথ, আচমকাই বাসটি খাদে পড়ে যায় কয়েক হাজার ফুট নীচে তাতে অনেক লোকের মৃত্যু হয়। এই মর্মান্তিক ঘটনায় সুন্দরলালের মন ভেঙে গেল। তিনি ভাবলেন মানুষের সর্বনাশী লোভেই এর একমাত্র কারণ। গান্ধীজীর কথা মনে পড়ে যায়— পৃথিবীর প্রচুর সম্পদ রয়েছে মানুষের প্রয়োজন মেটানোর জন্য কিন্তু মানুষের লোভের কাছে এ তুচ্ছ, ক্ষুদ্র।

কর্মযোগী মানুষ ছিলেন সুন্দরলাল বহুগুণা। জীবনের শেষে গঙ্গা ছেড়ে এসে উপস্থিত হলেন দেরাদুন শহরের কোলাহলময় স্থানে। সারাজীবন প্রকৃতিকে ভালোবেসেছেন। এজন্য আমৃত্যু সংগ্রাম করে গেছেন। প্রাচীন ঋষিদের মতো শ্বেতশুভ্র মূর্তি। সাদা কাপড়, সাদা জামা, সাদা চুলদাড়ি। সৌম্যকান্তি। আত্মমগ্ন। জীবনে অনেক পুরস্কার পেয়েছেন কিন্তু সেগুলির তেমন গুরুত্ব দেননি। তাঁর একটাই কথা— 'কোনও কিছু পাওয়ার জন্য আমি কাজ করিনি। কাজ করেছি এই দেশের নদী, গাছপালা, মানুষ, ভূমি, প্রকৃতিকে ভালোবেসে।' তাঁর খেদোক্তি ছিল, কী নিষ্ঠুরভাবে হিমালয় আর প্রকৃতিকে ধ্বংস করে চলেছে। ভাবতে কষ্ট হয়। শুধু অপেক্ষা, যখন মানুষ বুঝবে তখন অনেক দেরি হয়ে যাবে।

তাঁর এই অনুশোচনা হাতে হাতে ফলে পেল ২০২০ সালে ১৯ মে 'আয়লা' আর ২০২১ সালের ২৭ মে 'ইয়াশে'র তাণ্ডব নৃত্য। মানুষ বুঝেও এর প্রতিকারের চেষ্টা করে না। সর্বগ্রাসী লোভই আজ ধ্বংসের কারণ। □

বর্তমান যুগে সংস্কৃত ভাষার প্রয়োজনীয়তা

লিপিকা দত্ত

বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। বাংলাভাষা তথা সমগ্র ভারতীয় উপ-মহাদেশের প্রায় সমস্ত ভাষার উৎপত্তি সংস্কৃত ভাষা থেকেই। সংস্কৃতভাষা বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন ও সমৃদ্ধতম ভাষা। প্রাচীনতম অথচ বিজ্ঞানসম্মত নির্ভুল ব্যাকরণ রয়েছে একমাত্র এই ভাষাতেই। ভারতীয় ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও পরম্পরাকে আমরা খুঁজে পাই সংস্কৃতের মাধ্যমে। হাজার হাজার বছরের ভারতীয় সংস্কৃতি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে সংস্কৃত ভাষাতে। বর্তমানে যুগে সংস্কৃত ভাষার প্রয়োজনীয়তা এক কথায় অপরিসীম ও অন্যতম।

ভারতীয় ঐতিহ্য অনুসারে সংস্কৃত ভাষার কোনো শুরু বা শেষ নেই, এটি চিরন্তন। স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার মুখনিঃসৃত বেদময়ী ভাষা। তাই সংস্কৃত ভাষাকে দেবভাষা বলা হয়। এই ভাষা প্রথম বেদে ব্যবহৃত হয়েছিল এবং পরে পরে এটি অন্যান্য ক্ষেত্রে ভাব প্রকাশের মাধ্যম হয়েছে। তবে অনেক সংস্কৃতবিদ্বেষী প্রচার করেন সংস্কৃত একটি মৃতভাষা, তবে তারা হয়তো জানেন না, বিশ্বব্যাপী সংস্কৃত ভাষার প্রচার, প্রসার ও জনপ্রিয়তা দিন দিন বাড়ছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বলা যায় জার্মানির কথা। বর্তমানে জার্মানিতে ১৪টি বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রায় ১২০০ টি স্কুলে সংস্কৃত ভাষা পড়ানো হচ্ছে। ভারতের উত্তরাখণ্ডও রাজ্য ভাষা হিসেবে সংস্কৃতকে ঘোষণা করেছে। একথা সত্য যে, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে দেবভাষা সংস্কৃত ভাষার প্রতি সকলে ক্রমশ টান অনুভব করছে। তাই ভারতীয় সংবিধানের অষ্টম তফশিলে আধুনিক ভারতীয় ভাষার তালিকায় সংস্কৃত ভাষাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

প্রতিটি ভাষার মেরুদণ্ড হলো ব্যাকরণ, আর এই সংস্কৃত ভাষার মধ্যে একটি নিখুঁত ব্যাকরণ এবং সুন্দরভাবে নির্মিত কাঠামো রয়েছে। যা এই ভাষার ঐতিহ্য সমৃদ্ধ। আজ আমরা অনেকেই সঠিকভাবে জানি না কোথায় ই-কার, ঈ-কার বসবে সমাস ও সন্ধি প্রভৃতি ব্যাকরণের যাবতীয় বিষয়ের তথ্য সম্পর্কে জানতে হলে আমাদের পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী' ব্যাকরণ জানতে হবে যেখানে ব্যাকরণের প্রতিটি বিষয়ের সংজ্ঞা ও উদাহরণ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেওয়া আছে।

বিশ্বের সবচেয়ে সংগঠিত ও সংক্ষিপ্ত ভাষাগুলির মধ্যে একটি হলো সংস্কৃত। সমস্ত ভাষার মধ্যে শুধুমাত্র সংস্কৃত ভাষাই ন্যূনতম পরিমাণ শব্দ ব্যবহার করে কিছু বলার ক্ষমতা রাখে। সংস্কৃত অধ্যয়নে ভাষার গঠন বুঝতে সাহায্য করে ও একজনের ভাষাগত দক্ষতা, শব্দের স্পষ্ট উচ্চারণ ও শব্দচয়নের বোধগম্যতা এবং ক্ষমতাকে বাড়িয়ে তোলে।

বর্তমান যুগে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো বিজ্ঞান ও গণিত। সংস্কৃত গ্রন্থগুলিই প্রথম বহু গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক ও গাণিতিক ধারণার বর্ণনা দেয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, শূন্যের ধারণাটি প্রাচীন ভারতে ব্যবহৃত ব্রাহ্মী লিপিতে প্রথম বর্ণিত হয়েছিল, যা সংস্কৃত ভাষায় রচিত। দশমিক পদ্ধতি ছিল প্রাচীন গণিতের একটি বড়ো বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি কারণ দশমিক সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি যা ছাড়া গণিতের কোনো অগ্রগতি সম্ভব হতো না। সংস্কৃতবিদ আর্যভট্ট, তাঁর আর্যভটিয়ম্' গ্রন্থে প্রথম প্রকাশ করেন চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণের ব্যাখ্যা। পৃথিবীর ব্যাস ও পরিধি, বর্ষবিভাগ, গ্রহের আবর্তন পথ, ত্রিকোণমিতির নিয়ম ইত্যাদি বিষয়গুলির একটি স্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান করেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভারতীয় বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার বিকাশে সংস্কৃতের তাৎপর্য সম্পর্কে কথা বলেছেন, সমসাময়িক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সঙ্গে সংস্কৃতকে একীভূত করার কথা তুলে ধরেছেন।

এছাড়াও সংস্কৃতে একটি দীর্ঘ চিকিৎসার ঐতিহ্য রয়েছে। সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ঐতিহ্যগত ভারতীয় চিকিৎসা পদ্ধতি হলো আয়ুর্বেদ শাস্ত্র। বর্তমান বিশ্ব আজ সর্বব্যাপী রোগের চিকিৎসার জন্য আয়ুর্বেদের দিকে ঝুঁকছে। অনেক আয়ুর্বেদিক গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় রচিত হয়েছে। সংস্কৃত ভাষায় রচিত অথর্ববেদ চিকিৎসা শাস্ত্রের আকর স্বরূপ। যার প্রমাণ আমরা চরকসংহিতা ও সুশ্রুতসংহিতার মধ্যে পেয়ে থাকি। চরকসংহিতা একটি সংস্কৃত ভাষাসম্ভূত চিকিৎসার পাঠ্য। মানুষের শারীরস্থান, প্যাথলজি এবং বিভিন্ন রোগের নির্ণয় ও চিকিৎসা সম্পর্কে বিবরণ রয়েছে। অপরদিকে সুশ্রুতসংহিতায় অস্ত্রোপচারের ভিত্তি, যন্ত্রবিদ্যা ও শল্যবিদ্যার কৌশল বিষয়ে বর্ণিত করা হয়েছে। সুশ্রুতসংহিতা ও চরকসংহিতা এই পাঠ্যদুটি আজও আয়ুর্বেদিক অনুশীলনকারীরা অধ্যয়ন করেন এবং যা আজ আধুনিক চিকিৎসা অনুশীলনের এবং চিকিৎসা পদ্ধতির বিবর্তনের উপর প্রভাব ফেলছে।

বর্তমানযুগে আরেকটি অন্যতম বিষয় হলো কম্পিউটার। কম্পিউটারের সঙ্গে সংস্কৃত ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। আধুনিক কম্পিউটারের অ্যাপ্লিকেশনের জন্য সংস্কৃতকে সর্বোত্তম ভাষা হিসেব বিবেচনা করেছে। তাছাড়াও সংস্কৃত ভাষা কম্পিউটারের কোড এবং প্রোগ্রাম তৈরির ক্ষেত্রে ভীষণ ভাবে সাহায্য করে। তাই নাসার বিজানীরা সংস্কৃতকে কম্পিউটার-বান্ধব ভাষা হিসেবে নির্বাচিত করেছে।

সংস্কৃত আমাদের পূর্বপুরুষদের দেওয়া একটি মহান সম্পত্তি। কিন্তু বর্তমানে সংস্কৃত ভাষায় কথা বলা লোকের সংখ্যা ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। তাই সংস্কৃতকে পুনরুজ্জীবিত করে এটিকে কথ্য ভাষা করা সম্ভব কিনা তা আমাদের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ। কারণ সংস্কৃতই সমাজ ও সভ্যতার ধারক ও বাহক, হোক সেটা প্রাচীন, মধ্য বা নব্য। সংস্কৃত বিনা ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস জানা প্রায় অসম্ভব। □

জীবিকা নির্বাহের মাধ্যম তালপাতার হাতপাখা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গরমকালে সবার চাহিদা শীতল সমীরণের হালকা পরশ। কিছু দিন আগে পর্যন্ত ঘরে ঘরে বৈদ্যুতিক পাখা, এয়ার কুলার বা এয়ারকন্ডিশন মেশিন ছিল বেশ কম, কিছু কিছু ক্ষেত্রে বেশ বিরল। সেই সময় গরমকাল এলে তালপাতার হাতপাখা কেনার একটা হিড়িক পড়ে যেত। এখন ইলেক্ট্রিক ফ্যান বা এসি মেশিনের রমরমার যুগে তালপাতার পাখার চাহিদা গিয়েছে কমে। ফলে তালপাতার পাখা হারিয়েছে তার কৌলিন্য।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজ-১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির অধীন মায়াপুর অঞ্চলের কয়েক ঘর শিল্পী এই প্রাচীন কুটিরশিল্পটিকে বাঁচিয়ে রাখার লড়াইতে এখনও ব্রতী রয়েছেন। মায়াপুরের শেখ পাড়ার মনিরুল শা'র জীবিকা হলো তালপাতার হাতপাখা বানানো। গত ৪০ বছর ধরে এই জীবিকাকে সম্বল করেই তিনি জীবন নির্বাহ করে চলেছেন। তার পরিবারও এই তালপাতা দিয়ে হাতপাখা তৈরির শিল্পের সঙ্গেই যুক্ত। এই গ্রীষ্মেও তাঁর স্ত্রী পাখায় রং করতে ব্যস্ত থাকেন। বেশ কিছু দিন আগেও এই অঞ্চলে প্রতিটি ঘরে ছিল এই কুটিরশিল্পের স্থান। রাজ্যে তখন তালপাতার পাখার চাহিদা ও কদর ছিল। বহু মানুষ এই পেশার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এখন এই শিল্পের পরিধি ক্রমশ সংকুচিত হয়ে চলেছে। বর্তমানে এই অঞ্চলে মাত্র ৩-৪ ঘর শিল্পী এই পাখা তৈরির শিল্পের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করছেন।

মনিরুল বাবু জানালেন, তাদের এই অঞ্চলে ভালো তালপাতা পাওয়া যায় না। বাঁকুড়া থেকে তালপাতা কিনে আনতে হয়। ৪০ জন শ্রমিক এই অঞ্চলের শিল্পীদের ঘরগুলিতে পাখা তৈরির নানা কাজ করে দেন। বিয়েবাড়ি এবং পুজোর সময় তালপাতার পাখার চাহিদা বেড়ে যায়। বিভিন্ন পুজো প্যান্ডেলে থিমের বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে এই তালপাতার হাতপাখা। কলকাতার বড়বাজারে আমাদের তৈরি এই পাখা পাইকারি হিসেবে বিক্রি করে আসি।

মল্লিক পাড়ার নুরুল হক জানালেন, তাদের বংশপরম্পরায় এই হাতপাখা বানানোর ব্যবসা ছিল। এখন আর এর তেমন বাজার নেই। ২০০০ সাল থেকে তাই এই ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে এখন অন্য কাজ করি। এই অঞ্চলের তালপাতার পাখার অন্যতম কারিগর ছিলেন শাজাহান মল্লিক। শোনা যায়, তাঁর বানানো পাখা কলকাতার শোভাবাজার রাজবাড়িতে দুর্গাপুজোর সময় যেত। তাদের পরিবারও এখন সেই ব্যবসা ছেড়ে দিয়েছেন। মনিরুল শা জানালেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কুটিরশিল্প দপ্তর যদি তাদের বিষয়টা দেখত তাহলে তাদের ব্যবসার সুবিধা হতো।

বজবজ-১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কানাইলাল দাস বলেন, বিষয়টি খোঁজ নিয়ে নিশ্চয়ই ব্যবস্থা নেব। তালপাতার পাখার কুটির শিল্পীদের যদি কোনো সমস্যা থাকে তারাও আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। প্রসঙ্গত, এই বছর গ্রীষ্মে প্রবল উত্তাপ ও তাপপ্রবাহের কারণে পাখা শিল্পীদের কাজের সুযোগ বেড়েছে। এছাড়াও বিদ্যুৎ বিভ্রাটের কারণেও বিভিন্ন অঞ্চলে সৃষ্টি হয়েছে হাতপাখার চাহিদা। ফলে এই পাখার বিক্রিবাটাও এই বছর বেশ ভালোই হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের লুপ্তপ্রায় এই কুটিরশিল্পটিকে বাঁচিয়ে রেখে, এই শিল্পের উপর ভিত্তি করে জীবিকা নির্বাহী শিল্পী পরিবারগুলির প্রয়োজন সরকারি সাহায্যের।

পরিবেশ দূষণকারী এসি মেশিনের বিপ্রতীপে প্রাকৃতিক তালপাতা-জাত এই হাতপাখার ভূমিকা প্রখর গরমে শরীর-মনকে ঠাণ্ডা রাখার ক্ষেত্রে সত্যিই অনস্বীকার্য। সম্পূর্ণ পরিবেশ বান্ধব এই পাখা গরমকাল মোকাবিলায় গ্রামে-গঞ্জে এখনও অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। রাজ্য সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ একটু নজর দিলে এই শিল্পটিকে রক্ষা করা সম্ভব। শিল্পটি বাঁচলে বেঁচে থাকবেন এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত এই রাজ্যের প্রান্তিক শিল্পীরাও।

নবজন্ম

স্থান— বিক্রমপুর। কাল— ৯৮২ খ্রিস্টাব্দ। পাত্র-পাত্রী— রাজা শ্রীকল্যাণ এবং রানি প্রভাবতী।

শ্রীকল্যাণ পাল সাম্রাজ্যের অধীনে এক সামন্ত রাজা। রানির পাশে শায়িত নবজাত শিশুপুত্র। রাজা এসেছেন পুত্রমুখ সন্দর্শনে। হঠাৎ কানে এল সমবেত বাদ্যযন্ত্র ধ্বনি। রাজা বিস্মিত হয়ে কক্ষ সংলগ্ন বারন্দায় এলেন। না, রাজপথে কোনো বাদ্যযন্ত্র বা শোভাযাত্রার চিহ্নমাত্র নেই। রানিকে বললেন– কাউকে তো দেখছি না, একটু আগে খুব জোরে বাজনা বাজছিল! রানি অবাক হয়ে বললেন— সে কী মহারাজ, এই গ্রীষ্মের দুপুরে রাস্তায় জনপ্রাণী নেই, আপনি বাজনার শব্দ কোথায় শুনলেন? রাজা বুঝলেন এসব অলৌকিক ব্যাপার, শুধুমাত্র তাঁরই গোচরে থাকবে— এটাই হয়তো ঈশ্বরের ইচ্ছা।

কয়েকদিন পরেই রাজা দেখলেন, শিশুর মাথায় পুষ্পাঞ্জলি বর্ষিত হচ্ছে আর শিশুর মুখখানায় কেমন যেন বৌদ্ধদেবী তারার সাদৃশ্য। সব বিস্ময়, আবেগ মনে চেপে রেখে রাজা শ্রীকল্যাণ শুধু রানিকে বললেন, আমাদের

এই পুত্রের মধ্যে দৈবীভাব রয়েছে। প্রভাবতীও ভাবেন, তাদের তো পদ্মগর্ভ ও শ্রীগর্ভ নামে আর দুই পুত্র রয়েছে। তারা তো এরকম নয়। ওদের নামের সঙ্গে মিলিয়েই তাঁরা এই পুত্রের নাম রাখলেন— চন্দ্রগর্ভ। যত দিন যাচ্ছে রাজা-রানির মনে হচ্ছে, চন্দ্রগর্ভ তো বাকিদের থেকে আলাদা!

বাল্যকাল থেকেই চন্দ্রগর্ভ অত্যন্ত মেধাবী। তন্ত্র, বেদ, পঞ্চবিজ্ঞান– সবই অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে আয়ত্ত করে ফেলে চন্দ্রগর্ভ। তরুণ চন্দ্রগর্ভ একদিন পিতার কাছে এসে বলেন— পিতা আমাকে অনুমতি দিন, আমি শুধুমাত্র বৌদ্ধসাহিত্য পঠনপাঠনেই নিমজ্জিত থাকতে চাই। সুদর্শন তরুণ পুত্রের দিকে চেয়ে রাজা শ্রীকল্যাণ বলেন, তোমার অন্তরের দেবতা যে নির্দেশ দেন, তাই-ই তোমার পালনীয় হোক।

সে রাতেই চন্দ্রগর্ভ স্বপ্ন দেখলেন, তথাগত বুদ্ধ চলেছেন শিষ্য পরিবৃত হয়ে। আর কী আশ্চর্য, সেই শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে রয়েছে সে নিজেও— মুণ্ডিত মস্তক ভিক্ষুবেশী চন্দ্রগর্ভ।

চন্দ্রগর্ভের মনে আর কোনো দ্বিধা নেই। অন্য ধর্মাচরণের কর্মকাণ্ডের দিকগুলি বৌদ্ধমতকে গ্রাস করতে চাইছে। না না, তিনি তা কোনোমতেই হতে দেবেন না। বৌদ্ধ দেবী তারা একদিন তাঁর স্বপ্নে দেখা দিলেন। বললেন— বৌদ্ধ ধর্মমতের পুনরুদ্ধারই তোমার ব্রত।

এদিকে রানি মাঝে মাঝে রাজাকে বলেন— চন্দ্র কি কোনোদিন সংসারী হবে না? এমন চোখ জুড়ানো ছেলের বিয়ে দিয়ে রাঙা বউ ঘরে তুলব, এ যে আমার অনেক দিনের বাসনা মহারাজ! রাজা শ্রীকল্যাণের চোখে বারেকের তরে ভেসে ওঠে চন্দ্রগর্ভের শৈশবের অলৌকিক দৃশ্যের কথা। তিনি বলেন, সব বাসনা তো সবসময় পূর্ণ হয় না রানি!

এদিকে আচার্য শীলরক্ষিত চন্দ্রগর্ভের নাম রাখলেন— অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। অতীশ দীপঙ্কর শুনলেন, তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্মমতের নিদারুণ দুরবস্থা চলছে। সারা দেহে তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করলেন তিনি। এত নিষ্ঠাভরে তাঁর বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন, তা কি সার্থক করে তুলতে পারবেন না?

সেই অদেখা, অজানা দেশেই তাঁকে যেতে হবে। তিনি যে তথাগত বুদ্ধেরই এক শিষ্য। শুধু এ জন্মে নয়, জন্মজন্মান্তরে। ভগবান অবলোকিতেশ্বরই তো তাঁর আরাধ্য দেবতা। অতীশের বৌদ্ধশাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের খবর পৌঁছে গিয়েছিল তিব্বতরাজ জ্ঞানপ্রভ'র কানে। তিনি শ্রমণ, বাহক, স্বর্ণমুদ্রা-সহ সসম্মানে অতীশকে তিব্বতে আসার আমন্ত্রণ জানালেন। এক মহান উদ্দেশ্যসাধনে অতীশ চললেন তিব্বতের পথে।

—রূপশ্রী দত্ত

নদ-নদী পরিচয়

ময়ূরাক্ষী নদী

ময়ূরাক্ষী নদী ঝাড়খণ্ড রাজ্যের দেওঘর থেকে ১৬ কিলোমিটার দূরে ত্রিকূট পাহাড় থেকে উৎপন্ন হয়েছে। তারপর ঝাড়খণ্ডের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলার মধ্যে দিয়ে ভাগীরথী নদীতে মিশেছে। নদীর গতিপথ প্রায় ২৫০ কিলোমিটার। পশ্চিমবঙ্গে এর উপনদীগুলি হলো ব্রাহ্মণী, দ্বারকা, বক্রেশ্বর ও কোপাই। শুখা মরসুমে এই নদীর জল ময়ূরের চোখের মতো স্বচ্ছ হয়ে যায়, তাই মনে হয় এরকম নাম হয়েছে। সিউড়ী শহর থেকে সাড়ে পাঁচ কিলোমিটার দূরে তিলপাড়ায় ১৯৪৯ সালে ৩০৯ মিটার দৈর্ঘ্যের ব্যারেজ নির্মাণ করা হয়েছে। এখান থেকে জলবিদ্যুৎ তৈরি হয়। তাছাড়া তিলপাড়া একটি পর্যটন কেন্দ্রও বটে।

এসো সংস্কৃত শিখি– ২৬

বালিকা: –বালিকা। বালিকায়া: – বালিকার।
বালিকায়া: নাম কিম্ ? বালিকায়া: নাম সুবর্ণা।
বালিকায়া: নাম কিম্ ? বালিকায়া: নাম চৈতালি।
শিক্ষিকায়া: – শিক্ষিকার। লেখিকায়া: – লেখিকার।
বৈদ্যায়া: – ডাক্তারের। পত্রিকায়া: - পত্রিকার।।

অভ্যাস করি–

শিক্ষিকায়া: নাম পিয়ালী । লেখিকায়া: নাম শবরী।
গায়িকায়া: নাম শ্রেয়া। সেবিকায়া: নাম স্নেহলতা।
পরিচারিকায়া: নাম সন্ধ্যা। বৈদ্যায়া: নাম শেফালি

প্রয়োগ করি—

সেবিকা, গায়িকা, ভৃত্যা, সঞ্চালিকা, পরিচারিকা, ছাত্রা, মহিলা, কন্যা, অম্বা, পাচিকা।

(আ-কারান্ত স্ত্রীলিঙ্গে এরূপ হয়। অর্থাৎ মেয়েদের নামের সঙ্গে য়াঃ/য়া: যুক্ত হয়।)

ভালো কথা

কহলগাঁওয়ে গঙ্গার দ্বীপে

আমি পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্র। এবার গরমের ছুটিতে গঙ্গার দ্বীপে এক মনোমুগ্ধকর প্রকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করার সৌভাগ্য হলো। স্কুলে গরমের ছুটি হওয়ার দিনই বাবা- মায়ের সঙ্গে বিহারের ভাগলপুর হয়ে পরদিন কহলগাঁও শহরে এলাম। সেদিনই বিকেলে নৌকা করে আমরা গঙ্গার দ্বীপে বটেশ্বর মহাদেব মন্দিরে পৌঁছলাম। এই প্রথম আমার নৌকায় ওঠার অভিজ্ঞতা হলো। পাহাড় কেটে বানানো মন্দিরে আমরা ঠাকুর দর্শন করলাম। ওখানে গঙ্গার শান্ত ও মনোরম পরিবেশ মনকে মুগ্ধ করে দিচ্ছিল। তারপর আমরা দ্বিতীয় মন্দিরে গিয়ে ঠাকুর দর্শন করে বালিতে খুব লাফালাফি করলাম। তারপর সন্ধ্যায় গঙ্গায় অস্তমিত সূর্যের প্রতিবিম্ব দেখতে দেখতে আমরা ফিরে এলাম।

রুদ্রাঙ্কুশ ঘোষ, ষষ্ঠশ্রেণী, ত্রিমোহিনী, দঃ দিনাজপুর

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

আমার জেঠু

মৌমিতা দেবনাথ, দশম শ্রেণী, নিমতা, কলকাতা-৪৯

আমার জেঠু বড়ো আদরের
আবদারের আরেক নাম,
জেঠু মানেই বাবারও উপরে
থাকে যে তাঁর মান।
জেঠু মানেই রাগ ভোলানো
মিষ্টি মধুর কথা,
জেঠু মানেই সকল সময়
ভুলায় সকল ব্যথা।
জেঠু মানেই সঙ্গী এক
হেথায় হোথায় যাওয়া,
জেঠু মানেই বাঁচন আমার
মায়ের মার খাওয়া।
তাইতো বলি আমার জেঠু
সেরা সবার থেকে
ভাগ্য লাগে এমন জেঠু
বারে বারে পেতে।

লেখা পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা ই-মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

PIONEER®
EXERCISE BOOK

Manufacturer of Exercise Book
& Office Stationery

PIONEER PAPER & STATIONERY PVT. LTD.
74, Beliaghata Main Road, Kolkata 700 010 India. Phone +91 33 2370 4152 / 2373 0556. Fax +91 33 2373 2596
Email pioneerpaperco@gmail.com. www.pioneerpaper.co

With Best Compliments from -

A
Well wisher

বঙ্গের স্বল্প পরিচিত ফল ও লোকসংস্কৃতি

ড. মনাঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায়

বিজ্ঞানী সমাজের কৌলিন্য সেভাবে না পেলেও লোকসমাজ কিন্তু গৌণ ফলগুলিকে আন্তরিক ভাবেই গ্রহণ করেছে। গুরু-শিষ্য পরম্পরায় তপোবনগুলিতে গৌণ ফলগাছ রোপণ করার রীতি ছিল। দ্বাদশ শতকের বিদুষী নারী খনা তার প্রবাদগুলিতে কয়েকটি গৌণ ফলের নাম উল্লেখ করেছেন, উল্লেখ করেছেন তার চাষ পদ্ধতিও।

'শকুন্তলা' গ্রন্থে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখছেন, 'খুব ভোরবেলায় তপোবনের যত ঋষিকুমার বনে বনে ফল ফুল কুড়তে গিয়েছিল। তারা আমলকী বনে আমলকী, হরীতকী বনে হরীতকী, ইংলী ফলের বনে ইংলী কুড়িয়ে নিলে...।' পশ্চিমবঙ্গে একটি প্রবাদ আছে— 'বারো মাসে বারো ফল, না খেলে যায় রসাতল।' এই 'বারো ফল'-এর অধিকাংশই গৌণ ফল বা অপ্রধান ফল, ইংরেজিতে Minor Fruits। উদ্ভিদ বিজ্ঞানীরা গৌণ ফল বলতে বোঝেন যেগুলি অন্যান্য ফলের চাইতে কম সুস্বাদু, বাজারে যাদের চাহিদা কম, যেগুলি কেবলমাত্র সীমাবদ্ধ অঞ্চলে জন্মায়, যেগুলির সংগঠিত চাষাবাদের প্রচলন নেই এবং যে সমস্ত ফল চাষে কৃষি উপকরণের প্রয়োগ কম। সুতরাং গৌণ ফল হচ্ছে Less appealing fruits অর্থাৎ স্বল্প আকর্ষণীয় ফল। কোনো কোনো গৌণ ফল আবার wild fruits বা বন্য ফল যেমন কেঁদ বা কেন্দুফল (Diaspyros tomentosa), ইংলী বা তাপস তরু (Terminalia catapps), বকুল ও জিলিপি (Inga dulsis)। 'গ্রাম বাঙ্গলার উপকথা'য় রেভারেন্ড লালবিহারী দে বেশ কয়েকটি গৌণ ফলের কথা লিখেছেন : 'তারা (ছেলের দল) খানিক ঝোপে-ঝাড়ে ঘুরে বেড়াল, ফলের খোঁজে গাছে চড়ল। বৈঁচি পেড়ে খেল, চারদিকে বৈঁচি গাছের অন্ত ছিল না। টক টক করমচা পেড়ে খেল। তবে সবচেয়ে যে ফল পছন্দ ছিল, তার নাম ফলসা। প্রকাণ্ড এক ফসলা গাছও ছিল ওখানে। ওরা সেই গাছ বেয়ে উঠে হনুমানের মতো ডালে ডালে বসে মিষ্টি ফলসা খেতে লাগল।'

গৌণ ফলগুলি খনিজ লবণ আর খাদ্যপ্রাণের সমৃদ্ধ উৎস, কৃষিক্ষেত্রে সহিষ্ণু বলেই এরা যথেষ্ট পরিচিত। গ্রামের বাড়ির দোরগোড়ায় অনায়াসে জন্মায়, সেচ-সার, যত্নআত্তি না পেয়েও নির্লজ্জ বেয়ারার মতো ফল দিয়ে যায়। প্রতিকূল পরিবেশে সহজে মানিয়ে চলতে পারে বলে পতিত জমিতে চাষ করা বেশ লাভজনক। তাই জাতীয় স্বাস্থ্য প্রকল্পে ক্ষুধা আর অপুষ্টির মোকাবিলার জন্য এই ফলগুলি দেবদূতের ভূমিকা নিতে পারে। রোগ উপশমের বৈশিষ্ট্যের জন্য আয়ুর্বেদ সমেত অন্যান্য ভারতীয় চিকিৎসা ধারায় গৌণ ফলগুলি স্মরণাতীতকাল থেকে ব্যবহার হয়ে আসছে। পুষ্টি আর চিকিৎসা মূল্য ছাড়াও কয়েকটি স্বল্প ব্যবহৃত গৌণ ফলের বর্ণ প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে সাফল্যের ছাড়পত্র দিয়েছে।

শত শত বছর ধরে বঙ্গের পল্লী মানুষের মুখে মুখে ফিরে চলেছে খনার ছন্দোবদ্ধ বচন। ধরে নেওয়া যায় খনার বচনগুলি লোকায়ত কৃষি-দর্শনের সম্প্রসারণ। সেই হিসেবে বাংলাদেশে গৌণ ফল গবেষণার প্রথম নিদর্শন হচ্ছে খনার বচন। ডাকের বচন নামে পরিচিত বঙ্গের লোকসমাজে প্রচলিত প্রবাদগুলিতেও গৌণ ফলের উল্লেখ আছে। সম্ভবত প্রবাদগুলি ডাকপুরুষ, ডাকগোয়ালা বা ডাক নামের কোনো ব্যক্তির অভিজ্ঞতা প্রসূত ছন্দোবদ্ধ কবিতা। ডাক বলেছেন, 'অভুক্তা বড়োই, ভুক্তা বেল, ডাক বলে— পরাগ গেল।' অর্থাৎ খালি পেটে কুল আর ভরা পেটে বেল খেলে শরীরের পক্ষে অনিষ্টকর। খনা বলেছেন, 'হাত বিশ করি ফাঁক। আম কাঁঠাল পুঁতে রাখ।/গাছ গাছালি ঘন সবে না। গাছ হবে তার ফল হবে না।' কিংবা 'আমে বান, তেঁতুলে ধান'। 'যত কুয়া আমের ক্ষয়, তাল তেঁতুলের কিবা হয়।' 'যদি না হয় আগনে বৃষ্টি। তবে না হয় কাঁঠালের সৃষ্টি।' এই সমস্ত প্রবাদগুলিতে উল্লিখিত গৌণ ফল সম্পর্কিত তথ্য কৃষি-বিজানীরা আজও অযৌক্তিক বলে ফেলে দিতে পারছেন না। এছাড়াও অসংখ্য গৌণ ফল সংক্রান্ত প্রবাদ বঙ্গের বিবিধ অঞ্চলে প্রচলিত আছে— কোথাও লোকৌষধ রূপে, কোথাও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে। তার কয়েকটি উল্লেখ করা হলো :

১. একটা হরিতকী সারা গাঁয়ের উপকারী।

২. জরুয়া দেখে জামীরের ভারা।

৩. কাঁচা তেঁতুল যেমন তেমন,/পুরানো তেঁতুল বিকারে।

৪. খালি পেটে বদরিকা, ভরা পেটে বেল/কবিরাজ দেখে বলে এ রোগী তো গেল।

৫. বেল খেয়ে খায় জল, তার হয় বুকে বল,/তাল খেয়ে খায় জল, সে হয় রসাতল।

৬. এক পুরুষে রোপে তাল, পর পুরুষে করে পাল, অপর পুরুষে ভুঞ্জে তাল।

৭. বারো বছরে ধরে তাল, যদি না লাগে গোরুর লাল।

৮. তাল বাড়ে ঝোপে, খেজুর বাড়ে কোপে।

৯. কোথাকার কে, আমড়া ভাতে দে।

১০. কাঁঠাল খেয়ে লাগল আঠা, তেল দিয়ে খুটাও লেটা।

১১. আর গাব খাব না, গাবতলা দিয়ে যাবে না। গাব খাব না খাব কি, গাবের মতন আছে কী?

১২. আশা করছেন কাও, পাকলে খাবেন ডাঁও।

১৩. আম আমড়া কুঁজড়া ধান, এ তিন নিয়ে বর্ধমান।

১৪. খেজুর বাগ ছোটো ঘর, এটাই হৈল যশোহর।

১৫. তাল, বাবলা ছুঁচো বোঁচা, এই চার নিয়ে মুড়োগাছা।

১৬. আম আমড়া শিমূল, ফাগুনের জলে নির্মূল।

বাংলা ধাঁধার রাজ্যে গৌণ ফলের ছড়াছড়ি। ধাঁধার প্রহেলিকাময় প্রশ্নে গৌণ ফলের বহিরাকৃতি, অঙ্গ সংস্থানিক গঠন বিবরণ এবং অপরাপর অত্যাবশ্যকীয় তথ্য প্রায় নিখুঁত ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন বঙ্গের লোককবিরা। কয়েকটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে।

গোলাপজাম : ধুনি ফনি কও চাই।/কোন ফলের বাকল নাই। (ঢাকা)

চালতা : রাজার বাড়ির পাতি হাঁস।/খায় খেলা ফেলে শাঁস। (খুলনা)

জাম : ১. আকাশ থেকে পড়ল জ্যাঠা,/বক্‌রি মরল প্যাট ফ্যাটা। (ঢাকা)

২. চ্যাংড়ত থাকত সাদা, জুয়ানত লাল, বুড়াত কালে খাইতে ভাল। (রাজশাহী)

জামরুল : গাছটি ভরে যায় সহস্র ফলে/বীজে হয় না গাছ, গাছ হয় ডালে। (২৪ পরগনা)

তেঁতুল : শিশুকালে বস্ত্র পরে বসন্তের মাসে।/যুবাকালে সেই বস্ত্র ঢিলা হয়ে আসে। বৃদ্ধকালে বস্ত্রহীন, শুন শিশুগণ।/ লজ্জাহীন হয়ে কবে হাটেতে গমন। (২৪ পরগনা)

কাঁঠাল : ই-ঘরে বুড়ি ম(ই)রল, উ-ঘরে বাস গেল। (পশ্চিম রাঢ়)

কেন্দ : হুড়কা খুলে গুড়। (পুরুলিয়া)

কামরাঙা : গাছের ফল গলায় ঝোলে (ফরিদপুর)

বেল : ১. তিন তিরিক্কা পাতা সর্বডালে কাঁটা
খাতি লাগে মজা, মুহি নাগে আঠা (খুলনা)

২. এ মোর ও মোর তে মোর ঘর,

ও মোর ও মোর তে মোর ঘর,
ভিতরে মাংস উপরে হাড়। (ফরিদপুরু)

মহুল (মহুয়া) : ১. উপরে খোসা, তলে ডিম/ দেখ্‌বো ভোঁদা পাথর ডিম। (পুরুলিয়া)

২. মা বেটির একেই নাম, ডুবকা ছঁড়ার ভিনু নাম। (পশ্চিম রাঢ়)

আতা : কপাট কুলপ তেতালা/মা ধব ছা কালা। (পুরুলিয়া)

গাব : এমন একটা ফল দেখা আছে দুনিয়ায়,
তারে আবার কত লোক খাচ্ছে দেখ ভাই।
উলটে দেওয়া মাত্র সে উড়ে চলে যাবে,
যদি তারে ধরতে পার জবাই করে খাবে। (ঢাকা)

প্রস্তুত প্রবন্ধে উল্লিখিত প্রবাদ ও ধাঁধার ভাণ্ডার অনুসন্ধান করলে বুঝে নিতে অসুবিধা নেই, বঙ্গের লোকসমাজে গৌণ ফলগুলি কী মহিমায় বিরাজ করছে।

পশ্চিমবঙ্গের উপেক্ষিত গৌণ ফলগুলির মধ্যে সর্বাগ্রে নাম করতে হয় কাঁঠাল, বেল, জাম, কুল, জামরুল এবং কামরাঙার। এছাড়াও অন্যান্য গৌণ ফলগুলি হচ্ছে আমড়া, গোলাপজাম, আমলকী, গাব, কেঁদ, কয়েৎবেল, ডেওয়া, আঁশফল, ফলসা, নোনা, আতা, পানিফল, তাল, খেজুর ও বকুল।

বেশ কয়েকটি গৌণ ফল উচ্চমাত্রায় খরা সহনশীল। সেই জন্য পশ্চিম সীমান্ত পশ্চিমবঙ্গের লাল কাঁকুরে মাটিতে ও ঊষর ও আধা ঊষর আবহাওয়ায় ভালোই জন্মায়। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, বীরভূম ও বর্ধমানের পশ্চিমাঞ্চলে কুল, বেল,

আমলকী, কয়েতবেল, করমচা, আতা, বুনো খেজুর, কেন্দু, ফলসা, ডালিম ও ডুমুর অর্থকরী ভাবে চাষ করা সম্ভব। তবে এখানে কাঁঠাল, কামরাঙা চাষ সম্ভব নয়। এ রাজ্যের নদীয়া, কোচবিহার ও জলপাইগুড়িতে কাঁঠাল ভালোভাবে চাষ করা যাবে। জাম, তেঁতুল, যেহেতু আংশিক খরা সহনশীল, কাজেই পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর ছাড়াও নদীয়া, ২৪ পরগনা, মুর্শিদাবাদে ভালোই হবে। জামরুল মূলত দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার একটি ক্ষুদ্র অঞ্চলে (বারুইপুর সংলগ্ন এলাকা) অর্থকরীভাবে চাষ হয়। কামরাঙার মূল উৎপাদন অঞ্চল ২৪ পরগনা হলেও বীরভূম ও বাঁকুড়ায় খারাপ হচ্ছে না, তবে সেচের বন্দোবস্ত রাখতে হবে।

বেলেমাটিতে তাল, বনখেজুর, ফলসা কয়েতবেল, কুল, খিরনী, ডুমুর প্রভৃতি গৌণ ফল ভালোভাবেই জন্মাতে পারে। এঁটেল মাটিতেও তাল গাছ হয় এবং আমড়া, জামের গাছও চোখে পড়ে। দোঁয়াশ মাটিই সব ধরনের গৌণ ফল চাষের আদর্শ মাটি। কামরাঙা ও বিলিম্বি প্রভৃতি ছায়াচ্ছন্ন এলাকায় বিক্ষিপ্ত আলোতেও জন্মাতে পারে এবং এই পরিস্থিতিই তারা অধিক পছন্দ করে। কয়েকটি ফল উচ্চমাত্রার অম্লমাটি সহ্য করতে পারে যেমন চুকর, বেল, ডুমুর প্রভৃতি। তবে কামরাঙার হালকা অম্ল মাটি সহ্য করার ক্ষমতা রয়েছে। আঁশ ফল, প্যাসান ফল, লকেট ও কাঁঠালের অম্লমাটি সহ্য করার ক্ষমতা মাঝারি। পক্ষান্তরে আতা, খেজুর, আমলকী ও ফলসা ক্ষারীয় মাটিতে ভালোই ফলন দেয়। আবার উচ্চ লবণাক্ত মৃত্তিকা সহ্য করতে পারে খেজুর, কুল, আমলকী, বেল, খিরনী প্রভৃতি। ডালিম, জাম, ডুমুর, আঁশফল, ফলসা, প্যাসান ফলের লবণ সহ্য করার ক্ষমতা মাঝারি।

গৌণ ফলগুলির মধ্যে কাঁঠাল, জামের মতো বৃক্ষের আয়ুষ্কাল ৫০ থেকে ১০০ বছর, তাল, ডুমুরের ৩০ থেকে ৭০ বছর, আমলকী, ডালিম, কুল, গোলাপ জামের বয়সকাল ২০ থেকে ৪০ বছর, প্যাসান ফল, আতা, বৈঁচি, ফলসার আয়ু ১৫ থেকে ৩০ বছর।

বেল, খেজুর ও আতার মতো ফলে কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ অধিক। কাঁঠাল ও খেজুরে ভিটামিন-এ মেলে, কয়েতবেল ও করমচায় ক্যালসিয়ামের মাত্রা বেশি, খেজুর, করমচার লোহার ভাগ যথেষ্ট, আমলকী ও বার্বাডোজ চেরীতে ভিটামিন-সি-এর মাত্রা অতি উচ্চ, বেলে ভিটামিন-বি-এর মাত্রা অধিক।

আমলকীর ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে বীরভূমের সিউড়ি অঞ্চলে তার মোরব্বা বিশেষ জনপ্রিয়, জনজাতি সমাজে তা বিশেষভাবে সামদৃত। বেশ কিছু ভেষজ ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থা যেমন ডাবর ইদানী অর্থকরী ভাবে আমলকী চাষ শুরু করেছে। কাজুর ফল বা কাজু-আপেল ভিটামিন-সি সমৃদ্ধ, এতে উচ্চমাত্রায় পলিফেনল রয়েছে। কাজু ফলের রস প্রক্রিয়াকরণের অপেক্ষায়, এমনকী মাদক পানীয় হিসেবেও। যেহেতু আয়ুর্বেদাচার্যরা জামকে মধুমেহ রোগের পথ্য রূপে সুপারিশ করছেন, তাই জামের রসকে পানীয় শিল্পে ইদানীং গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। পানীয় শিল্পে তালের নীরাও আগামীদিনে আগ্রহের ছাড়পত্র পেতে চলেছে। প্রায় ১০ থেকে ১২ শতাংশ প্রাকৃতিক শর্করায় সমৃদ্ধ তালের নীরা হিমায়িত অবস্থায় সতেজ পানীয় হিসেবে বাজারে আসার প্রতীক্ষায়।

রানি চন্দ তাঁর 'আমার মা'র বাপের বাড়ি' গ্রন্থে লিখেছেন, খেজুর গাছ ঝোড়ানো সিউলি সম্প্রদায়ের কথা : 'জাউভাতের সঙ্গে সদ্য জ্বাল দেওয়া ঘন খেজুর রস— অমৃত। সুরভিত রস, সুবাসিত চাল— দুই মিলিয়ে এক প্রাণ মাতানো সম্ভার। তুলসীমণ্ডপের ধারে এক সারি খেজুর গাছ, লম্বা— কোথায় উঠে গেছে গাছের মাথা। শীত আসছে, শীত আসবার আগে মা'র 'গাছি ভাই' এসে দাঁড়ায় খেজুর গাছ কাটতে। কোমরে মোটা দড়ি জড়িয়ে কাস্তে কাটারি পিঠের দিকে গুঁজে গাছি-ভাই গাছ বেয়ে উঠে যায় উপরে। পুরনো ডাল শুকনো ডাল কেটে সাফ করে। লম্বা লিকলিকে গাছি ভাই, পরনে লেংটির মতো এক ফালি কাপড়। কাপড়ের চেয়ে বেশি দড়ি তার কোমরে জড়ানো। এই কাজে দড়িরই যত প্রয়োজন। গাছের সঙ্গে কোমর একসঙ্গে ঘুরিয়ে বেঁধে গাছের গায়ে দু' পা চেপে দড়িতে দেহের ভর ছেড়ে তবে দু' হাতে দা ধরে খেজুর গাছের ডাল কাটে মাথা চাঁছে গাছিভাই। শীতকালে তাজা রস খাওয়ার একটা নেশা আমাদের। অন্ধকার থাকতে থাকতে আসে গাছিমামা। আমরা তার আগেই উঠে খেজুরতলায় গিয়ে বসে থাকি, এক-একটা কাঁসারবাটি কোলে নিয়ে। ...গাছিমামা এসে গাছে উঠে কুয়াশার ফাঁক দিয়ে লম্বা রেখায় রোদ এসে পড়ে। আমরা বাটি বাটি রস খাই।'□

জলসম্পদের সংরক্ষণ জরুরি

শেখর সেনগুপ্ত

একটি সুপরিচিত সাহিত্যগোষ্ঠীর দ্বারা আয়োজিত বইমেলায় আমন্ত্রিত হয়ে বছর তিনেক আগে বর্ধমান শহরে গিয়েছিলাম। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষ হতে বেশ রাত হয়ে যাওয়ায় আমি আর সেই রাতে কলকাতায় ফিরে আসতে পারিনি। পরদিন সকালে আমি বাস অথবা ট্রেন ধরে হাওড়া স্টেশনের উদ্দেশে পাড়ি জমাবার পরিবর্তে চলে গেলাম বর্ধমান শহরের বিবেকানন্দ কলেজে, যে কলেজে প্রথম জীবনে আমিই ছিলাম ইতিহাসের অধ্যাপক। এখন পৌঁছে গিয়ে দেখলাম, কলেজের সামনে যে খোলা জায়গা, সেখানে তাঁবু খাটিয়ে একটি সভা প্রায় জমে উঠেছে কলেজেরই ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে এবং সেখানে ভাষণ দিচ্ছেন কলেজেরই প্রিন্সিপ্যাল, আমার এক সময়ের সহকর্মী দুলেন্দু মিত্র।

অতঃপর দুলেন্দুর অনুরোধে আমি সেই সভাতেই কিছু বক্তব্য রাখতে বাধ্য হলাম। সভার বিষয়টা ছিল, উচ্চশিক্ষা গ্রহণের পর একজন ছাত্র বা ছাত্রী কোন কোন বিষয়ে নিজেকে সড়গড় করে তুলতে পারলে সরকারি বা বেসরকারি স্তরে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে উন্নততর চাকরি একটা পেয়ে যেতে পারে। আমি নিজে যখন বছর খানেকের জন্য স্টেটব্যাংক অব ইন্ডিয়ার স্টাফ কলেজে ফ্যাকালটি হয়ে ছিলাম হায়দরাবাদে, তখন মাঝে মধ্যেই আমাকে ক্লাস নিতে হতো আমাদের দেশের বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদের সম্ভার সম্পর্কে ব্যাংককর্মী ও অফিসারদের অবহিত করতে। আমি তখন বলতাম, আপনারা মনে রাখবেন, আমাদের এই দেশ অতীব জনবহুল। এই বিপুল সংখ্যক জনতার কিছু বড়ো সমস্যার অন্যতম হলো বিভিন্ন স্থানে কম-বেশি জলাভাব। শিল্পায়নকে বিস্তৃততর করতে প্রয়োজন কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণে জলের সরবরাহ। আবার আমাদের এ কথাও জানা দরকার যে, একজন মানুষের শরীরের ৭২ শতাংশই হচ্ছে জলীয় পদার্থ, যার অভাব দেখা দিলে সংশ্লিষ্ট মানুষটির অকালমৃত্যুও একটি স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। এই কারণেই আমরা প্রায়শ বলে থাকি, জল মানেই জীবন। এহেন জলের রিসাইক্লিং অর্থাৎ ব্যবহৃত জলকে পুনর্ব্যবহারযোগ্য করে তোলা একটা খুব বড়ো কাজ। তদুপরি আমরা যখনই জন্মভূমির সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নে নজর দিয়ে থাকি, জলের যথাযথ ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব না দিয়ে পারি না। জল যেন মানুষ ও প্রকৃতিকে একই বন্ধনে আবদ্ধ করে রেখেছে।

কিন্তু জলচক্রে জটিলতা বিলক্ষণ। একদিকে যেমন এই তরল জগতের তৃষ্ণা মেটায় তেমনই পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করে সমগ্র প্রকৃতির সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে চলেছে। ভূমিক্ষয় রোধ করতেও জলের ভূমিকা অনস্বীকার্য। ভূখণ্ডের ওপর সবুজের অবস্থানকে নিশ্চিত করে রাখতে জলের ভূমিকা অদ্বিতীয়। তাই জলের সঞ্চয়, জলজ প্রবহমানতা এবং অকালকে স্বকাল করণে জলের সক্ষমতা সৃষ্টির আদিপর্ব থেকে অদ্যপি একই ছন্দে স্থিতিশীল।

তাই মানুষমাত্ররই অবশ্য করণীয় জলসংরক্ষণ। আর আমাদের এই জনবহুল দেশে জলসংরক্ষণের বিষয়টা দুনিয়ার অন্য অনেক দেশের চেয়ে নানা কারণে কেবল কঠিনতর নয়, এই কাজ দাবি করে সকল নাগরিকেরই একনিষ্ঠ হুঁশিয়ারি। সেখানে কোনও রাজনৈতিক কলাকৌশলের প্রয়োগ অনভিপ্রেত। অপ্রয়োজনে জলের ব্যবহার কেবলমাত্র অপচয় নয়, ঘোরতর অমানবিক দুষ্কর্ম। এই বোধকে সর্বজনীন হতেই হবে। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস যখন বৃষ্টির দেখা মেলে না, দেশের নদী ও জলাশয়গুলির জলস্তর নামতে নামতে শেষমেশ কর্দমাক্ত অবস্থায় চলে আসতে পারে। মাঠের ফসল জলাভাবে শুকিয়ে অকালে খড়-বিচালিতে রূপান্তরিত হতে পারে। মাটির তলায় জলের যে ভাণ্ডার, তাতেও বিপজ্জনকভাবে টান ধরে। ফসলের

উৎপাদন হ্রাস পেতে পেতে দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া নেমে আসে। এমত প্রকৃতি নির্ভরতাকে মানুষ কোনো দিন কাটিয়ে উঠতে পারেনি, পারবেও না। যে সকল দেশে জলের জন্য বারোমাস হাহাকার, সেই দেশগুলিতে জলের জোগান বাড়াবার জন্য কয়েকটি উপায় এবং পদ্ধতি রয়েছে, যাদের মধ্যে নিম্নোক্ত ব্যবস্থাপনা অবশ্যই কার্যকর :

(ক) বনাঞ্চল ও তৃণভূমির ওপর মানুষদের হামলা বন্ধ করতে হবে।

(খ) যে সকল অঞ্চলে বৃক্ষনিধন অবাধে চলেছিল, সেই এলাকাগুলিতে নতুন করে শুরু করতে হবে বৃক্ষরোপণ।

(গ) সরকারি অনুমতি ছাড়া কাছ কাটা চলবে না।

(ঘ) যে সকল এলাকায় বৃক্ষনিধন চলেছে, সেই সকল এলাকায় অথবা তাদের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে তৈরি করতে হবে ছোটো— বড়ো বনাঞ্চল।

(ঙ) কৃষিকর্মে এমন বিজ্ঞান-নির্ভর পরিবর্তন কিছু আনতে হবে, যেখানে নিত্য জলসিঞ্চন অত্যাবশ্যক হয়ে থাকবে না; কৃষিজমিতে ব্যবহৃত জলে কীটনাশক রাখবার যে রীতি অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, তাতে পরিবর্তন আনতে হবে।

(চ) কৃষিজমির বৃহৎ পরিধি নিয়ে রয়েছে যে সকল গ্রামাঞ্চল, তাদের নিয়ে গঠন করা উচিত 'সিউয়েজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট'।

পরিতাপের বিষয়, আমাদের রাজ্যে এখনও যথার্থ পন্থায় জলকে বিশুদ্ধ রাখবার জন্য রাজ্যসরকার বহু বছর ধরেই তেমন মাথা ঘামায়নি। গয়ংগচ্ছ মনোভাব অদ্যাপি বর্তমান এই সকল ক্ষেত্রে, যেহেতু সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটারদের সমর্থন আদায় করতে ইত্যাকার প্রকল্প জটজলদি তেমন দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। তাপ প্রবাহের দিনগুলিতে সাধারণ নাগরিকরা পানীয় জলের সরবরাহ অব্যাহত থাকলেই খুশি। জলের বৃহত্তর ভূমিকা নিয়ে চিন্তিত হবার অবকাশ তাদের তেমন তীব্র হয়ে ওঠেনি আজ অবধি। বৃষ্টির মাধ্যমে প্রাপ্ত জলের সংরক্ষণ এবং তার যথাযথ ব্যবহারকে সুনিশ্চিত করতে, প্রথাগত ব্যবস্থাপনাকে উন্নততর করতে আজও জনআন্দোলন সেইভাবে সংগঠিতই হয়নি। বাম আমলেও নয়; তৃণমূলের আমলেও নয়। জলের মানকে উন্নততর করবার প্রযুক্তি আমাদের নজরে সেভাবে আসেনি। সরকারি প্রয়াসও বিরল। জলসংরক্ষণের জন্য প্রয়োজন একটি সুস্থিত কর্মসূচি। দেশের বিজেপি সরকারই সর্বপ্রথম 'ওয়াটার পাওয়ার প্ল্যান্ট' শীর্ষক একটি পৃথক মন্ত্রক গঠন করেছে সম্প্রতি। এর গুরুত্ব অনুধাবনযোগ্য। জলবিষয়ক নীতি রচিত হয়েছে। ওই মন্ত্রকের তত্ত্বাবধানে যে বিজ্ঞানসম্মত কার্যধারা নির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং কাজও শুরু হয়েছে, তা নিম্নরূপ :

১. ভূগর্ভস্থ জলের অপব্যবহার বন্ধ করতেই হবে।

২. শুকিয়ে আসা নদী ও খালগুলির পুনরুজ্জীবন নিশ্চিত করতে হবে।

৩. সেচের কাছে নদী, খাল ও নালার জলকে যথার্থ ভাবে ব্যবহার করতে হবে। ফলে চাষের উন্নয়ন ও বাস্তবায়িত হবে।

৪. আন্তঃরাজ্য নদী-বিবাদগুলিকে দ্রুততার সঙ্গে মেটাতে হবে।

৫. প্রয়োজনে একাধিক নদীও খালের সংযুক্তিকরণকে উপেক্ষা করা যাবে না।

৬. কৃষিতে জলের ব্যবহার যেন যথাযথ হয়; কম বা বেশি হলে চলবে না।

৭. প্রতিটি পরিবার জল ব্যবহার করবে যথার্থ প্রয়োজন মোতাবেক। অবব্যবহার বন্ধ করতে হবেই।

৮. জল নিয়ে এক রাজ্যের সঙ্গে অন্য রাজ্যের বিবাদ অবিলম্বে মেটাতে হবে দেশের সার্বিক স্বার্থে।

৯. সর্বোপরি, নদ-নদীর অববাহিকা ও তজ্জনিত কারণে প্রকৃতির আচরণের প্রতি সর্বক্ষণ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক এবং খুব প্রয়োজন হলে নদী বা খালের গতিপথে পরিবর্তন আনা সম্ভব কিনা, বিশেষজ্ঞরা বিবেচনা করে দেখবেন।

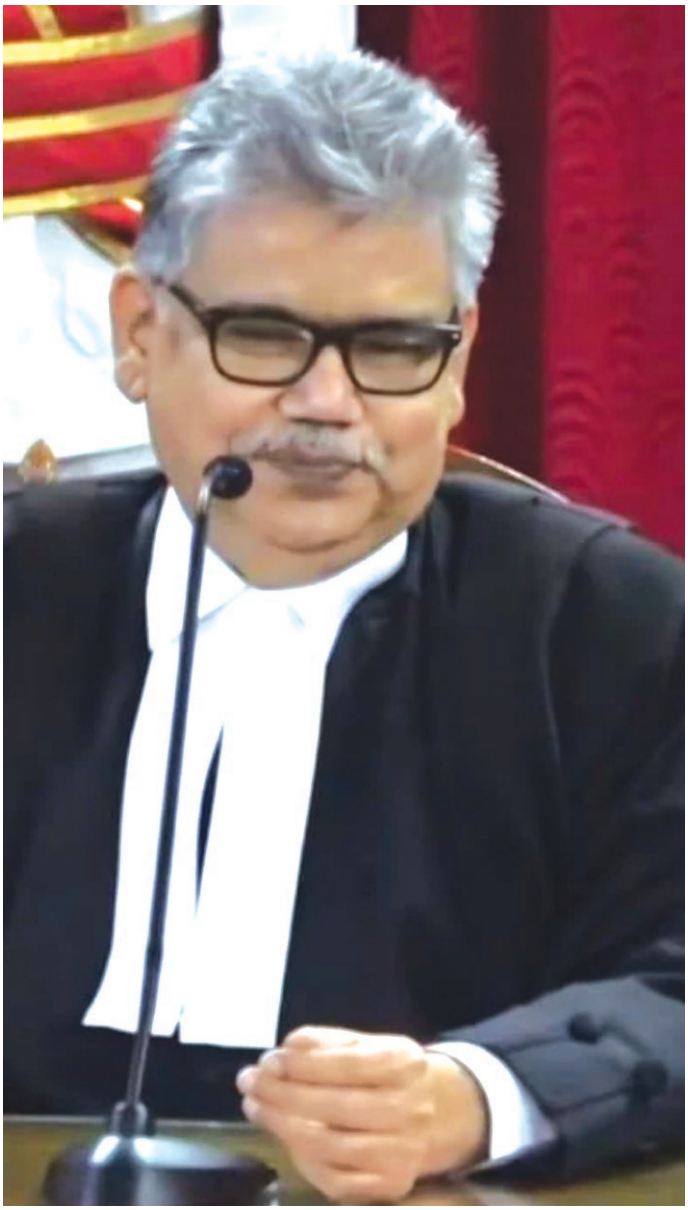

অবসরের দিন নিজের স্বয়ংসেবক পরিচয় সামনে আনলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ২০ মে অবসরগ্রহণ করলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি চিত্তরঞ্জন দাশ। অবসরের দিন তিনি জানিয়েছেন যে তাঁর ব্যক্তিত্ব গঠন এবং তাঁর মধ্যে সাহস ও দেশপ্রেমের ভাব জাগানোর সম্পূর্ণ কৃতিত্ব রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের। অবসরের দিন বিচারপতি চিত্তরঞ্জন দাশ জানান, একেবারে ছোটবেলা থেকেই তিনি সঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। তিনি বলেন, 'আজ, আমাকে অবশ্যই আমার সত্যিকারের রূপ প্রকাশ করতে হবে। একটি প্রতিষ্ঠানের কাছে আমার অনেক ঋণ আছে। আমি আমার শৈশব থেকে যৌবন পর্যন্ত সেখানেই ছিলাম। এই সংস্থার কাছ থেকে আমি সাহসী ও ন্যায়পরায়ণ হতে শিখেছি এবং সর্বোপরি, যেখানেই কাজ করি না কেন, দেশপ্রেমের অনুভূতি এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধতা নিয়ে কাজ করতে শিখেছি। স্বীকার করতেই হবে, আমি সঙ্ঘের একজন স্বয়ংসেবক।

তবে বিচারপতি পদে বসার পর, সঙ্ঘ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছিলেন বলে দাবি করেছেন বিচারপতি চিত্তরঞ্জন দাশ। তাঁর আরও দাবি, দলমত নির্বিশেষে তিনি সমস্ত মামলা এবং মামলাকারীদের নিরপেক্ষভাবে বিচার করেছেন এবং সম্মুখীন হয়েছেন। তিনি বলেন, 'কাজের জন্য, আমি প্রায় ৩৭ বছর ধরে নিজেকে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছি। আমি আমার কর্মজীবনের কোনো অগ্রগতির জন্য আমার স্বয়ংসেবক পরিচয় ব্যবহার করিনি। কারণ এটি আমার নীতি-বিরুদ্ধ। আমি সবার সঙ্গে সমান আচরণ করেছি। কমিউনিস্ট হোক, বিজেপি হোক বা তৃণমূলের লোক হোক, আমি কারও বিরুদ্ধে কোনো পক্ষপাতিত্ব করিনি। দুটি নীতির ভিত্তিতে আমি ন্যায়বিচার দেওয়ার চেষ্টা করেছি। একটি হলো সহানুভূতি এবং দ্বিতীয় নীতিটি হলো— ন্যায়বিচারের জন্য আইনকে বাঁকানো যেতে পারে, আইনের সঙ্গে মানানসই করার জন্য ন্যায়বিচারের অদল-বদল ঘটানো যায় না'।

বিচারপতি চিত্তরঞ্জন দাশ আদতে ওড়িশার বাসিন্দা। ১৯৮৬ সালে আইনজীবী হিসেবে নথিভুক্ত হয়েছিলেন তিনি। ১৯৯৯ সালে, তিনি বিচারক হয়েছিলেন। ওড়িশার বিভিন্ন এলাকায় অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এরপর তাঁকে ওড়িশা হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার (প্রশাসন) পদে নিয়োগ করা হয়। ২০০৯-এর ১৯ অক্টোবর, ওড়িশা হাইকোর্টের বিচারপতি পদে উন্নীত হয়েছিলেন তিনি। ২০২২-এর ২০ জুন, কলকাতা হাইকোর্টে তিনি স্থানান্তরিত হয়েছিলেন।

মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ চেয়ে নৈহাটিতে সন্ন্যাসীদের স্বাভিমান যাত্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সম্প্রতি নির্বাচনী জনসভার মঞ্চ থেকে মুর্শিদাবাদের বেলডাঙার ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের কার্তিক মহারাজকে আক্রমণ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর বিতর্কিত মন্তব্যের প্রতিবাদে গত ২৪ মে কলকাতার রাজপথে খালি পায়ে হাঁটেন সাধুসন্তরা। একই ইস্যুতে গত ২৬ মে বিকেল বঙ্গীয় সন্ন্যাসী সমাজের উদ্যোগে, ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলার হিন্দু জাগরণ মঞ্চের তরফে নৈহাটিতে সংঘটিত হয় 'সাধু-সন্ন্যাসী স্বাভিমান যাত্রা'। নৈহাটির গৌরীপুর চৌমাথা থেকে এই প্রতিবাদী যাত্রাটি শুরু হয়ে নৈহাটি বড়মা মন্দিরের কাছে শেষ হয়। এই পদযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন সন্ত সমাজের প্রতিনিধি স্বামী সঞ্জয় শাস্ত্রী, ভোলাগিরি আশ্রমের স্বামী সদানন্দজী, স্বামী সর্বানন্দজী-সহ বিভিন্ন সাধু সম্প্রদায়। সাধুসন্তদের পাশাপাশি ব্যারাকপুর জেলা হিন্দু জাগরণ মঞ্চের সম্পাদক রোহিত সাউ, যুব মোর্চার রাজ্য সম্পাদক উত্তম অধিকারীও এই শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। হিন্দুসমাজকে কালিমালিপ্ত করার প্রতিবাদে এই বিরাট পদযাত্রায় যোগ দিয়ে সন্ন্যাসীরা আওয়াজ তোলেন যে মুখ্যমন্ত্রীকে নিঃশর্তে ক্ষমা চাইতে হবে। অন্যথায় তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করছেন। আগামীদিনে বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হওয়ার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন সাধুসন্তরা। একই দিনে হাবরাতে

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের উদ্যোগে একটি প্রতিবাদী পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়।

আগুনে ভস্মীভূত ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের ডালখোলার প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দির, সরব বাঙ্গালি সমাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ আগুনে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ পরিচালিত ডালখোলা প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দির। গত ২৬ মে (রবিবার) হওয়া এই ঘটনায় সরব হয়েছেন বহু মানুষ। বিশিষ্ট সাংবাদিক সন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় এই ঘটনার জন্য তৃণমূলনেত্রীর সাম্প্রতিক ভাষণকে দায়ী করেছেন।

সন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন— 'মিলছে হিসাব? ঘুমোন বাঙ্গালি, ঘুমোন। উত্তর দিনাজপুরে দেবীনগর, রায়গঞ্জে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের ডালখোলা স্বামী প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দিরটি এমনি এমনি পুড়ে গেল? সবে শুরু। দেখতে থাকুন নির্বাচন শেষ হলে কী কী হয়। আপনারা ঘুমোন, বাঙ্গালি ঘুমোন। ঘুম থেকে উঠে দিদি নম্বর ওয়ান দেখে নিয়ে আবার লম্বা ঘুম ঘুমোন। জ্বলুক ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্কুল। আক্রান্ত হোক জলপাইগুড়ি রামকৃষ্ণ মিশন। আর অন্যদিকে সংবাদমাধ্যম খবর ছাপুক'।

তাঁর আরও দাবি, 'এই সাংবাদিকতাই মমতার শক্তি বাড়িয়েছে। যেভাবে রাজ্যের প্রায় সব দফতরে চুরি, লুঠ দেখেও বছরের পর বছর চুপ থেকেছে বাংলা সংবাদমাধ্যম, আজ ঠিক একই ঢঙে এই নোংরামির পরও তারা চুপ। আর এটাই চেয়েছেন মমতা। সেটাই ফিরিয়ে দিচ্ছে বাংলা মিডিয়া। অস্বীকার করবেন?'

এই প্রশ্নগুলি তুলে সন্ময়বাবুর এই পোস্টটি করার চার ঘণ্টার মধ্যে ৫৩ জন মন্তব্য করেছেন। তাতে তাঁদের মূল বক্তব্য, পশ্চিমবঙ্গ ধীরে ধীরে বৃহত্তর বাংলাদেশের দিকে এগোচ্ছে। কেউ লিখেছেন 'হোক প্রতিবাদ', কেউ আবার লিখেছেন, 'রাজ্য সরকার সরাসরি হিন্দু বিরোধিতায় নেমে পড়েছে। এতদিন অগোচরে হিন্দুধর্মের বিরোধিতা করত এই সরকার'। এদিকে আগুনে গোটা স্কুল পুড়ে যাওয়ার পর ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ ও প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দির পরিবার উত্তর দিনাজপুর শাখার তরফে জানানো হয়েছে— ডালখোলা প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দির রবিবার আগুনে পুড়ে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়েছে। ফলে এই স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকারাও সংকটে পড়েছেন। ক্লাস নেওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এই মুহূর্তে স্কুলটি বড়োসড়ো আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হয়েছে এবং স্কুল চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন জিনিসের সংকট দেখা দিয়েছে। স্কুলের পুরো শিক্ষা ব্যবস্থাকে ফিরিয়ে আনার জন্য তাঁরা আর্থিক সাহায্য চেয়েছেন সাধারণ মানুষের কাছে। অনলাইনের মাধ্যমেও সাহায্য তাঁরা নেবেন বলে জানিয়েছেন। সেক্ষেত্রে তাঁরা একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নম্বর দিয়েছেন।

বাংলাদেশ ভেঙে খ্রিস্টান দেশ গঠনের চক্রান্তের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ বাংলাদেশ ভেঙে একটি খ্রিস্টান দেশ গঠনের ষড়যন্ত্র চলছে। এই বিস্ফোরক অভিযোগ করেছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি আরও অভিযোগ করেছেন, একটি শক্তিশালী দেশ বঙ্গোপসাগরে ঘাঁটি বানাতে চায়। তিনি তা হতে দিচ্ছেন না বলেই তাঁর

সরকারের সামনে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা হচ্ছে। বাংলাদেশে সাম্প্রতিক নির্বাচনের আগে এই ঘাঁটি বানানোর অনুমতি দেওয়ার বদলে বিশেষ সহায়তার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ করেছেন বাংলাদেশি প্রধানমন্ত্রী। তবে, সেই 'শক্তিশালী দেশটির' নাম করেননি হাসিনা। প্রসঙ্গত, ইন্দোনেশিয়া ভেঙে একটি 'ইস্ট তিমোর' নামক একটি খ্রিস্টান দেশ সম্প্রতি গঠিত হয়েছে।

আওয়ামি লিগের নেতৃত্বে ১৪ দলের জোট সরকারের নেত্রী শেখ হাসিনা। গত ২৩ মে সন্ধ্যায়, ই ১৪টি দলের শীর্ষ নেতাদের একটি বৈঠক ছিল। সেই বৈঠকের শুরুতে শেখ হাসিনা বলেন, 'আমি যদি একটি বিশেষ দেশকে বাংলাদেশে তাদের এয়ারবেস বানাতে দিতাম, তাহলে আমার আর কোনো সমস্যা থাকত না। জানুয়ারির ভোটের আগে আমায় প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, এয়ারবেস বানাতে দিলে, আমার পুনর্নির্বাচন নিয়ে আর সমস্যা থাকবে না'। বিশেষজ্ঞ মহলের ধারণা— যাদের তরফে এই প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী কথিত বিশেষ দেশটি সম্ভবত আমেরিকা।

পরলোকে মেজর জেনারেল কার্তিক কুমার গঙ্গোপাধ্যায়

পূর্ব সৈনিক সেবা পরিষদের পূর্বতন রাজ্য সভাপতি মেজর জেনারেল কার্তিক কুমার গঙ্গোপাধ্যায় গত ২৯ মে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। তিনি দুই পুত্র, দুই পুত্রবধূ ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন। প্রয়াত গাঙ্গুলি সেনাবাহিনী থেকে অবসর গ্রহণের পর কলকাতা সল্টলেক জলবায়ু বিহারে সপরিবারে থাকতেন। ৩০ মে নিমতলা মহাশ্মশানে তাঁর দাহক্রিয়া সম্পন্ন হয়। পূর্ব সৈনিক সেবা পরিষদের বর্তমান রাজ্য সভাপতি কর্নেল কুণাল ভট্টাচার্য-সহ জলবায়ু জলবায়ু বিহারের বহু অবসর প্রাপ্ত সামরিক অফিসার তাঁর শবযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, প্রয়াত গাঙ্গুলি ১৯৬৫ ও ১৯৭১ সালে সংঘটিত পাক-ভারত যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি শ্রীলঙ্কায় প্রেরিত ভারতীয় শান্তি বাহিনীরও নেতৃত্ব দিয়েছেন। ২০১৩ সালে স্বামীজীর সার্ধশতবর্ষ উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ আয়োজিত তিনদিনের কল্যাণী যুব শিবিরে সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি।